চাঁদমামা
জুন ১৯৭৩
৭০ P

পেটের গোলমাল?
সে আবার কি বাপু?
কোনদিন শুনিনিতো!
ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার
প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়
শিশুদের বদহজম, অম্বল, পেটব্যাথা, বায়ু, ও দাঁতউঠার সময় ব্যাথার একটি সুস্বাদু সুনিশ্চিত সমাধান
GRIPE WATER
ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

সোয়ান কলমই
মহাকাশ—অভিযান-যুগের ছাত্রদের উপযোগী কলম
সোয়ান কলমই আধুনিক যুগের উপযোগী কলম। একমাত্র সোয়ান কলম দিয়েই অবাধে, স্বচ্ছন্দে লিখে চলা সম্ভবপর। সোয়ান অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ কলম কিনুন—এবং মহানন্দে চাঁদে অবতরণ করুন।
সবচেয়ে ভাল ফলের জন্য চাই
সোয়ান
ডিলাক্স কালি
SWAN
SWAN OXFORD
সোয়ান (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ
আদভানি চেম্বার্স, ফিরোজ শা মেহতা রোড, বোম্বাই—১
শাখা : ৩৪-বি কন্নট প্লেস নিউ দিল্লী—১
TRADE MARK
heros'-SI-120 Ben
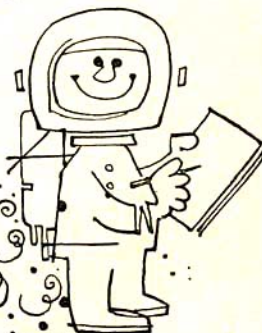
চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি

এ মাসের বেতাল কথা 'পরিবর্তন' একটি চমৎকার রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী। রাজা বিক্রমবর্মা প্রজাদের সুখ শান্তির প্রতি নজর রাখত। প্রজারা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পাশের দেশের রাজা দেবরাজ ছিল অত্যাচারি। তাই প্রজারা তার নিন্দা করত আর বিক্রমবর্মার গুণগান করত। এটা দেবরাজের কাছে অসহ্য লাগে। সে বিক্রমবর্মার বিরুদ্ধে একটার পর একটা চক্রান্ত করল। শেষে যা ঘটল তাতে পাঠকের ভালই লাগবে। এ ছাড়া আরও অনেক সুন্দর কাহিনী স্থান পেয়েছে।

খণ্ড ১ জুন ১৯৭৩ সংখ্যা ১২

অমর বাণী
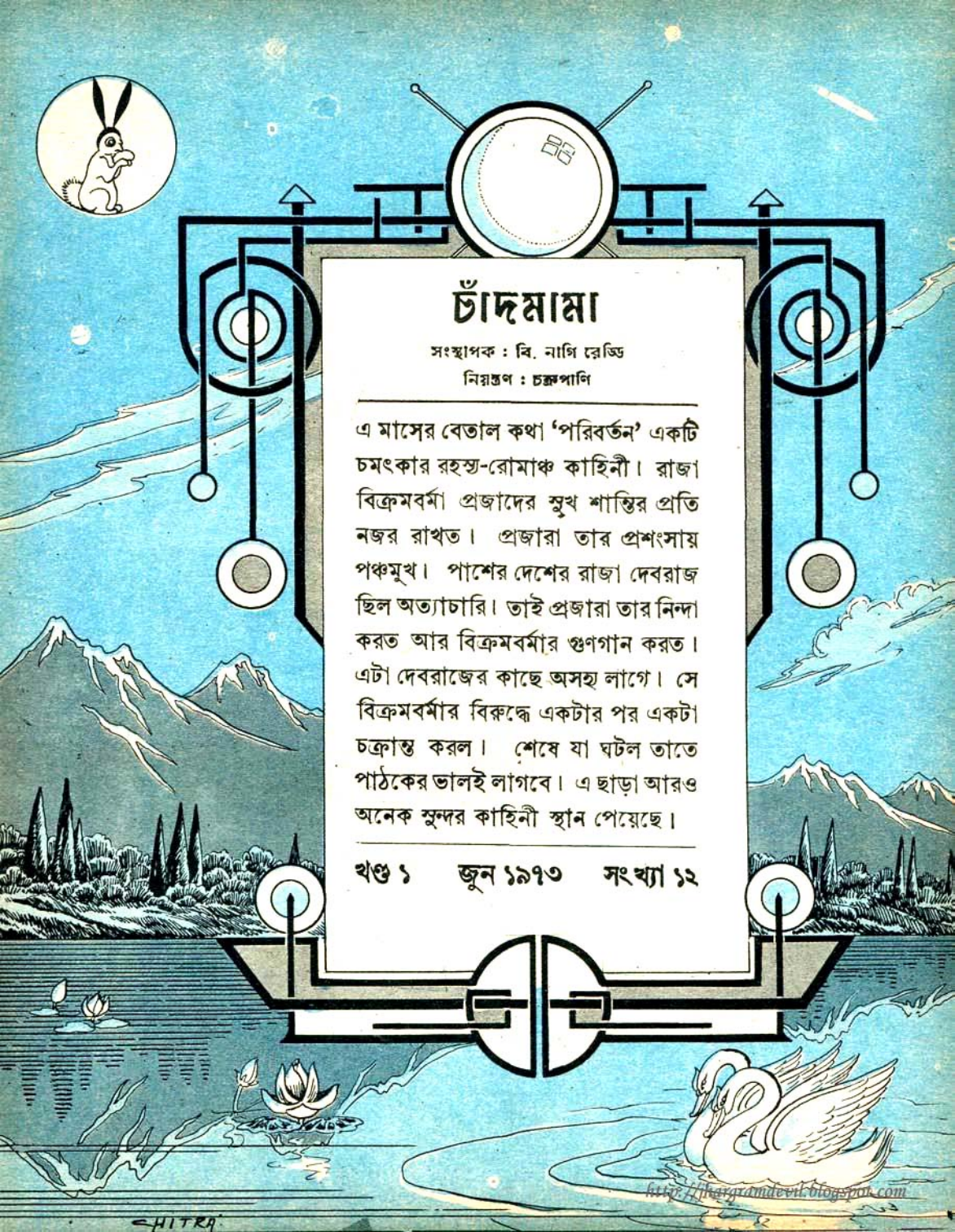
জীবন গ্রহণে নম্রাঃ,
গৃহীত্বা পুন রুন্নতাঃ ;
কিম্ কনিষ্ঠাঃ, কিমু জ্যেষ্ঠাঃ
ঘটীযন্ত্রস্য দুর্জনাঃ ? ॥ ১ ॥

[প্রাণ নেবার সময় বিনত থেকে প্রাণ নেবার পর উপরে ওঠে, (খালি থাকার সময় নিচে থেকে জল ভরে গেলে উপরে ভেসে উঠা) এটা ছোট ভাই না বড় ভাই ?]

মুখম্ পদ্মদলাকারম্,
বচ চন্দন শীতলম্,
হৃৎ কর্তারিসমম্ চাতি
বিনয়ম্ ধূর্ত লক্ষণম্ । ॥ ২ ॥

[পদ্মের মত মুখ মণ্ডল, চন্দনের মত শীতল কথা, কাঁচির মত মন এবং অত্যন্ত বিনয়ভাব ধূর্তের লক্ষণ ।]

উপকারেণ নীচানা
মপকারো হি জায়তে ;
পয়ঃ পানম্ ভুজম্গানম্
কেবলম্ বিষবর্দ্ধনম্ । ॥ ৩ ॥

[নীচ ব্যক্তিদের উপকার করলে অপকারই হয়, যেমন সাপকে দুধ খাওয়ালে বিষই বৃদ্ধি করে ।]

দুষ্টের প্রকৃতি

পদের লোভ

আজ থেকে এগার শো বছর আগেকার কথা। মধ্য চীনে চিয়াংলিঙ নামক নগরে কুও নামে এক ধনী লোক ছিল। কুওর বাবা ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছিল। কুও সুদে টাকা খাটানোর ব্যবসা করে খুব ধনী হল।

চাং নামে এক ব্যবসাদার কুওর কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ধার করে দূরে রাজধানীতে গিয়ে থাকতে লাগল। সে এই ধার শোধ করল না। কুও ঠিক করল চাং এর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে যাবে। শহরটাও ভাল করে দেখবে। কলা বেচা মেলা দেখা দুটোই হবে। তাই সে মা, বোন আর ভাইদের দেখা শোনার ভার চাকর বাকরদের হাতে স'পে দিয়ে নিজের একটা জলযানে করে বেরিয়ে পড়ল। কুও খুব সহজেই চাংএর ঠিকানা পেয়ে গেল। কারণ রাজধানীতে এসে চাং অর্থের জন্য সবার কাছে পরিচিত ছিল। কুওর আসার খবর পেয়ে চাং খুব ঘটা করে কুওকে স্বাগত জানাল। সে বলল, "ধার শোধ করতে আমার অনেক দেরি হয়ে গেল। এত দেরি হওয়ার অবশ্য অনেক কারণ আছে। একটা কারণ হল এখানকার ব্যবসায় আমি ভীষণ ভাবে জড়িয়ে গেছি। সময় পাচ্ছি না তোমার কাছে যাওয়ার। আর দ্বিতীয়, এত টাকা নিয়ে যেতে আমার সাহসে কুলোচ্ছিল না। অন্য কারো হাত দিয়ে পাঠানো অনুচিত হবে মনে হচ্ছিল। এসে ভালই করেছ। তোমার সুদ আর আসল শোধ করে দেব।"

কুও নিজের পাওনা গণ্ডা হিসেব করে নিয়ে সে ঐ বিরাট নগরে টানা তিন বছর আনন্দ উপভোগ করে রয়ে গেল। টাকা পয়সা যখন কেউ জলের মত খরচ করে তখন তাকে ঘিরে কিছু লোভী মানুষের ভীড় জমে। গায়ক বাদক আর স্তাবকের দল অর্দ্ধেক টাকা শেষ করে ফেলল। পরে কুও ঠিক করল বাড়ি ফিরে যাবে।

কিন্তু বাধা পড়ল। মধ্য চীনের সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল। সবাই পরামর্শ দিল যে এই রকম অবস্থায় অত টাকা পয়সা নিয়ে যাতায়াত করা নিরাপদ নয়।

ঠিক তখন কুও একটা খবর পেল। সরকার নাকি টাকা নিয়ে পদ বিক্রি করছে। বড় বড় মর্যাদার পদের কেনা বেচা চলছে দেশে! বিদ্রোহ দমনের জন্য সরকারের অনেক টাকার দরকার। সরকার তাই কোন পদ খালি হলেই বিক্রি করছিল।

কুও কোন উঁচু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি। তাই তখনকার রীতি অনুযায়ী সে সরকারের কোন ছোট পদেরও উপযুক্ত ছিল না। কিন্তু পদ যখন টাকা দিয়ে কেনা যায় তখন অভাব কিসের।

"আমার কাছে পঁচিশ তিরিশ লাখ টাকাতো আছে, আমি কি ধরণের পদ কিনব?" কুও বন্ধুকে প্রশ্ন করল।

"তুমি সোজা সরকারকে এত টাকা দিয়ে দিলে বড় কোন পদ পেতে পার। কোন গ্রামের বিচারপতির পদ দিয়ে দেবে। নিজে গিয়ে দরবারের লোকের হাতে দিলে বড় শহরের শাসনকর্তার পদ পাবে।" বন্ধু পরামর্শ দিল।

কুও ভাবল একবার যদি সে শহরের শাসকের পদ পায় তবে তার জীবন ধন্য হবে। এসব করার আগে কুও একবার চাং এর সঙ্গে আলোচনা করতে চাইল।

"বন্ধু, তোমার কাছে যে টাকা আছে তা দিয়ে তুমি নিশ্চয় শহরের শাসকের পদ পেতে পার। কিন্তু সেই পদ তোমার পক্ষে লাভজনক হবে না। তুমি যখন ঐ পদে বসে কিছু রোজগারের ধান্দা করবে

তখন কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে তোমাকে সরিয়ে অন্যকে বিক্রি করে দেবে।" চাং বুঝিয়ে বলল।

কুও এ-কথার জবাবে বলল, "আরে ভাই আমি পদ নিয়ে টাকা রোজগার করতে চাই না। আমার কি টাকার অভাব? আমি যশ চাই। খ্যাতি চাই। সেই জন্যই পদ কিনতে চাই। দু মাসের জন্যও ঐ পদে থাকতে পারলে আমার পরিবার অনেক পুরুষ ধরে সেই যশ পাবে!"

"যা প্রাণ চায় কর।" চাং বলল।

চাং এর চেষ্টায় কুও একটা শহরের শাসক হল। কুওর ভীষণ আনন্দ হল।

কিছুকাল পরে কুও বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফিরে যা দেখল তাতে তার চক্ষু স্থির। সেখানকার নদী আগের মতই বইছিল কিন্তু সেই নদীর আশপাশের গ্রামের কোন চিহ্ন ছিল না। পাথর জমে রয়েছে নদীর দুই কিনারে। বিদ্রোহীরা ঐ গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি ভেঙ্গে ফেলেছে। গ্রামের লোককে মেরেছে ও বেঁধে নিয়ে গেছে।

কুও নিজের বাড়ি যে ঠিক কোন অঞ্চলে ছিল তা খুঁজে পেল না। জানতে পারল যে বিদ্রোহীরা তার ভাইকে মেরে তার বোনকে ধরে নিয়ে গেছে। বোনকে কোথায় নিয়ে গেছে, বোনের অবস্থা যে

কি হল তা সে জানতে পারল না। মার খোঁজ নিয়ে জানতে পারল যে দূরের কোন এক কুঁড়ে ঘরে থাকে। কুও তার মায়ের কাছে গেল।

ছেলেকে দেখেই বুড়ি মা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "বাবা, তোমার ফিরতে দেরি হলে আমাকে আর জ্যান্ত দেখতে পেতে না। আমি আর বাঁচতে পারতাম না।"

"মা যা হওয়ার হয়ে গেছে। ও সব কথা ভেবে আর কেঁদো না। আমি শহরে শাসকের পদ পেয়েছি। আমরা দুজনে ঐ শহরে গিয়ে দিন কাটাতে পারব। কোন অসুবিধা হবে না।" কুও বলল।

ছেলের কথা শুনে মার মনে কিছুটা শান্তি হল। কুও ভেবেছিল নতুন পদে বসে বিয়ে করে ফেলবে। কিন্তু বাড়ি ফিরে ঘরবাড়ির যে ছন্নছাড়া অবস্থা দেখল তাতে তার বিয়ে করার ইচ্ছে হারিয়ে গেল।

তারপর মা আর ছেলেতে মিলে একটা জলযানে চড়ে যুঁগ চৌ নগরে পৌঁছাল। সেখানে নদীর উত্তর তীরে বৌদ্ধদের তুষিত নামে এক মঠ ছিল। সেই মঠের সন্ন্যাসীরা এক উচ্চ পদের অধিকারীর আগমনের খবর পেয়ে তাকে স্বাগত জানাল। মা ও ছেলেকে ঘুরে ঘুরে মঠ দেখিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাল।

কুও তারপর নিজের জলযানটাকে একটা বট গাছে বেঁধে রাত্রে ঐ জলযানেই ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর রাত্রে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি শুরু হল। ঐ ঝড়ে বটগাছ পড়ে গেল জলযানের উপর। জলযানের ভিতর থেকে কোন রকমে নিজের মাকে বের করে বাঁচাল। রাত্রে মঠের দরজা বন্ধ ছিল। দরজার কড়া নেড়ে বা ধাক্কা দিয়ে কোন লাভ হল না। মা আর ছেলে বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল।

সকালে মঠের দরজা খুলল। কুও মাকে নিয়ে মঠের ভিতরে ঢুকল। মঠের অধিপতি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কি চোর ডাকাতের পাল্লায় পড়েছেন? এই অবস্থা কেন?" কুও জানাল যে তার জলযান বট গাছের নিচে পড়ে ভেঙ্গে গেছে।

মঠের অধিপতি ওদের একটা ঘরে আশ্রয় দিলেন। কুও সেখানকার নগর শাসকের সাহায্য চেয়ে পাঠাল। কিন্তু ইতিমধ্যে কুওর মা কঠিন অসুখে পড়ে মারা গেল। নগর শাসকের সাহায্যে কুও মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে পারল।

তারপর আর এক বিপদ দেখা দিল। চীনের রীতি অনুসারে মার মৃত্যুর পর ছেলে তিন বছরের মধ্যে নতুন কোন পদ গ্রহণ করতে পারবে না। মঠের লোক যখন জানতে পারল যে কুও কোন সরকারী পদে নেই, তার বিষয় সম্পত্তি বলতে আর
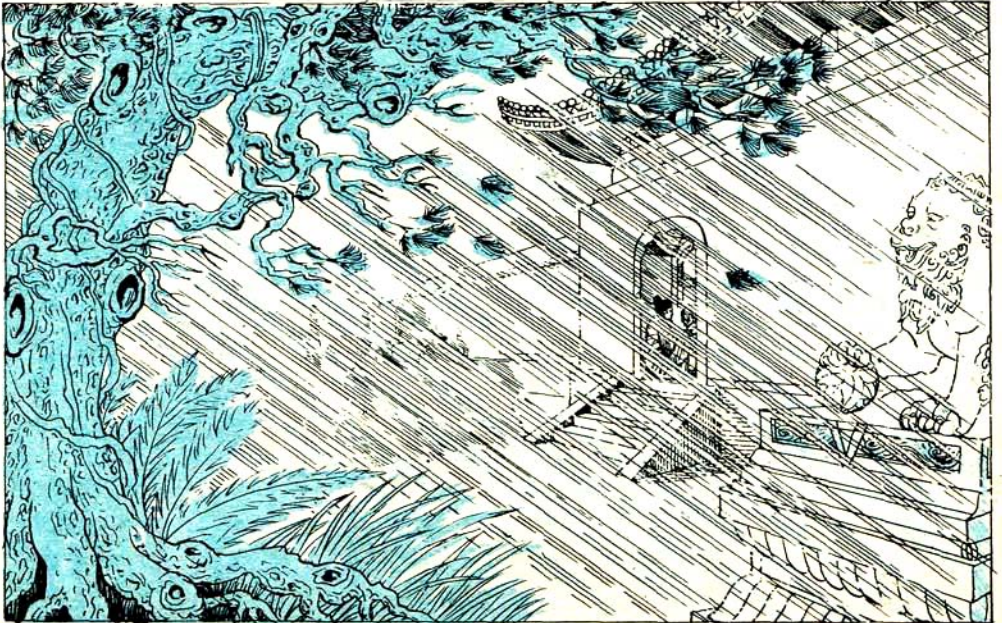
কিছুই নেই, ঘরবাড়ির কোন অস্তিত্ব নেই তখন তারাও মঠে তাকে রাখল না।

ফলে কুওকে আশ্রয় নিতে হয়েছে যুঁগ চৌ বন্দরের অধিকারীর বাড়িতে। অধিকারীও কুওকে অনন্তকাল খাইয়ে পরিয়ে রাখতে রাজী হল না।

"আমি আজ বাদে কাল নগরের শাসক হতে যাচ্ছি। আমাকে এভাবে অপমান করা উচিত হচ্ছে না।" কুও বলল।

"ভবিষ্যতে তুমি রাজা হলেই বা কি, যার কোন পদ নেই তাকে বসিয়ে বসিয়ে কে খাওয়াবে।"

কুওর আর দিন কাটে না। পয়সা নেই, কড়ি নেই। খাবে কি, পরবে কি। সে তখন নগর শাসকের সাহায্য প্রার্থনা করল।

নগর শাসক বলল, "তোমার দুরবস্থা দেখে একবার আমি সাহায্য করেছিলাম। তুমি যে ভবিষ্যতে নগর শাসক হবে তার কোন প্রমাণ দিতে পার? তোমাকে যে ঐ পদ দেওয়া হয়েছে তার কাগজপত্র কোথায়? বার বার বিরক্ত করতে আস কেন? যাও আর আমার কাছে এসো না।"

কুও বন্দরের অধিকারীর কাছে সোজা ফিরে এসে বলল, "আমি বাঁচব কি করে? আমার খাওয়া পরার ব্যবস্থা করে দিন।"

"তুমি কি কাজ করতে পার? যে কোন একটা কাজ করলেই রোজগার হবে।" বন্দরের অধিকারী বলল।

"জলযান চালাতে পারি। এছাড়া অন্য কোন কাজ তো পারি না।" কুও বলল।

বন্দরের অধিকারী তাকে নাবিকের কাজ দিল। তিন বছর কেটে গেল। কুও নাবিক হিসেবে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিল। নগর শাসকের পদ নেবার কোন চেষ্টাই সে আর করল না। তার মন থেকে পদের মোহ মুছে যেতে লাগল। নাবিকের কাজই তার কাছে বেশি ভাল লাগল। বাকি জীবনটা সে নাবিকের কাজ করেই কাটাল।
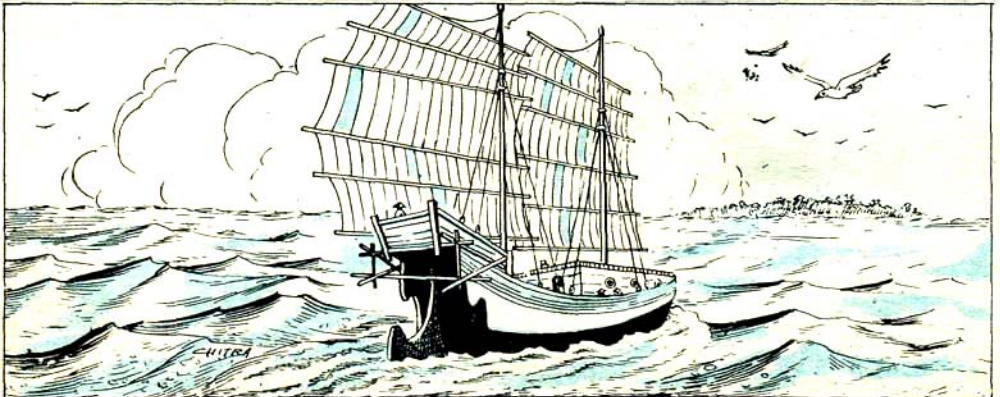
যক্ষপর্বত

এগার

[খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত ঐ পাহাড় বন জঙ্গলের মাঝে স্বর্ণাচারিকে দেখতে পেল। সে লুণ্ঠনকারীদের সঙ্গে বহাল তবিয়তে ছিল। স্বর্ণাচারির সঙ্গে যুবকদ্বয় পাহাড়ের উপরে উঠলে এক লুণ্ঠনকারী ছুটতে ছুটতে এসে জানাল যে তাদের নেতা সমরবাহুকে নরখাদক আদিবাসীদের নেতা বন্দী করেছে। তারপর···]

লুণ্ঠনকারীদের কথা শুনে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত অবাক হল। এতদিন ওরা বনে ঘুরে বেড়িয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত ওরা কোন মানুষ খেকো জাতির লোককে দেখতে পায়নি।

জীবদত্ত কিছুক্ষণ চুপচাপ কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, "তোমাদের নেতাকে ওরা পুড়িয়ে খাবে কি এমনি কাঁচা খেয়ে নেবে সেকথা আমরা পরে ভাবতে বসব। এখন আমাদের বলতো কেমন করে তোমাদের নেতা বন্দী হল? কি হয়েছিল বলতো।"

"হুজুর আমরা সকালে শিকার করতে গিয়েছিলাম। আমাদের চোখে পড়ল একটা হরিণ। হরিণ মেরে আমরা ফির-ছিলাম। পথে আমরা একটা বাঘের গর্জন

শুনতে পেলাম। আর শোনা গেল একটা মানুষের আর্তনাদ। যে দিক দিয়ে আওয়াজ আসছিল আমরা তিনজনে সেই দিকে ছুটে গেলাম। চোখে পড়ল একটা বাঘ আর একটা আদিবাসী। লোকটা বাঘের পায়ের নিচে পড়ে আছে। আর বাঘের বুকে বল্লম ঢুকে গেছে। বাঘের একটা বাচ্চা কাছাকাছি গর্জন করতে করতে ঘোরাঘুরি করছিল। লুণ্ঠনকারীরা বলল।

"ওটা হয়ত ঐ মরা বাঘিনীর বাচ্চা। আচ্ছা তারপর কি হল?" জীবদত্ত জিজ্ঞেস করল।

লুণ্ঠনকারীরা বলল, "আমাদের নেতা জানালেন যে তিনি ঐ বাঘের বাচ্চাকে এনে পুষবেন। আমি আস্তে আস্তে গিয়ে বাচ্চাটাকে ধরে ফেললাম। ইতিমধ্যে দশ বার জন আদিবাসী কোত্থেকে হাজির হল আমাদের সামনে। তাদের পরণে ভালুকের চামড়া। হঠাৎ তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের বন্দী করে ফেলল। আদিবাসীদের নেতা ভালুকের মাথার চামড়া ধারণ করেছিল। তাই তাকে ঠিক চেনা যাচ্ছিল না। নেতা আমার দিকে চোখ রেখে নিজের অনুচরদের বলল, "আরে এই লোকটাতো চমৎকার ধরে ফেলেছে বাঘের বাচ্চাটাকে। লোকটা খুব হুশিয়ার মনে হচ্ছে। সাহসীও বটে। একে আমরা আমাদের দলে ঢুকিয়ে নেব। নাও একেও তোমরা ভালুকের চামরা পরিয়ে দাও।" নেতার নির্দেশ মত তৎক্ষণাৎ তারা আমাকে ভালুকের চামড়া পরিয়ে দিল। আমাদের নেতা ও আমাদের এক সাথীকে ওরা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। বাঘের বাচ্চা নিয়ে ওদের সাথে আমাদের চলার হুকুম হল। আমরা চলতে লাগলাম। তারপর আমি···

লুণ্ঠনকারীর কথা শেষ হতে না হতেই জীবদত্ত বলল, "তাহলে তো তোমার ভাগ্য খুলে গিয়েছিল। ওদের দলে থেকে গেলে একদিন-না-একদিন তুমি ওদের নেতা হয়ে যেতে পারতে।"

একথা শুনে খড়্গবর্মা ও স্বর্ণাচারির সঙ্গে যারা এসেছিল তারা সবাই হো হো করে হেসে উঠল। ঐ লুণ্ঠনকারীও হেসে বলল, "কিছুক্ষণ যাওয়ার পর আমি বাঘের বাচ্চাটাকে ওদের নেতার উপর ছুঁড়ে দিলাম। বাঘের বাচ্চাটা নেতার কাঁধে পড়ে রাগে গর্জন করতে করতে তাকে কামড়ে আঁচড়ে অস্থির করে তুলল। নেতা বাঘের বাচ্চার সঙ্গে যুঝতে লাগল। তখন নেতাকে উদ্ধার করতে তার অনুচররা ব্যস্ত হয়ে উঠল। সেই সুযোগে আমি এক ফাঁকে ছুটে পালালাম।

জীবদত্ত লুণ্ঠনকারীকে বলল, "বা! তুমি তো দেখছি খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছ।" একথা বলে জীবদত্ত স্বর্ণাচারির দিকে ঘুরে বলল, "স্বর্ণাচারি, এখন আমাদের কর্তব্য কি ঐ আদিবাসীদের নেতার কবল থেকে লুণ্ঠনেতা সমরবাহুকে উদ্ধার করা?"

স্বর্ণাচারি জীবদত্তে কথার জবাব দিতে যাচ্ছে এমন সময় পাহাড়ের এক উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে যে লোকটা বনের সব দিক নজর রেখেছিল সে লাফাতে লাফাতে খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের কাছে গিয়ে বলল, "হুজুর, আমাদের এই পাহাড়ের নিচের বনে একদল আদিবাসী বাজনা বাজাতে বাজাতে ভালুক নাচাতে নাচাতে এদিকে আসছে।"
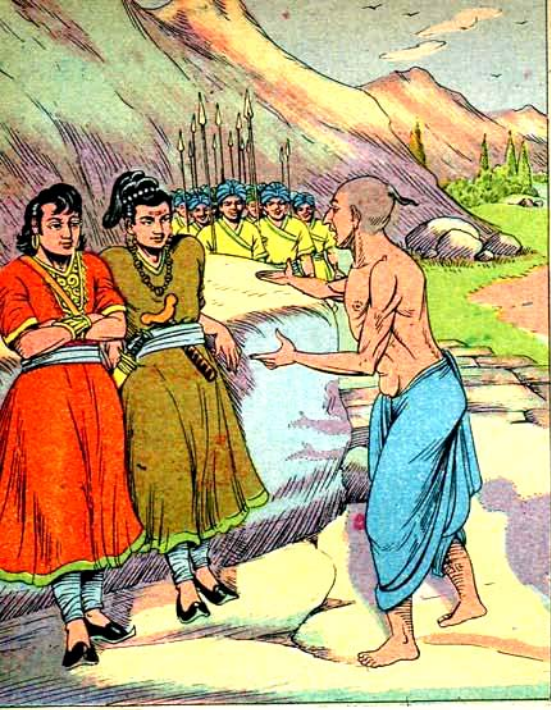
“ওরা কি আমাদের দিকে আসছে না বনের দিকে আপন মনে চলেছে? এই প্রশ্ন করতে করতে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত বনের দিকে তাকাল।

লুণ্ঠনকারীরা ঠিকই বলেছিল। নানান ধরণের বাজনা বাজাতে বাজাতে দশ বার জন আদিবাসী লুণ্ঠননেতা সমরবাহু ও তার এক অনুচরকে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল।

“খড়্গবর্মা, মনে হচ্ছে আদিবাসীরা আমাদের দিকে আসছে না। ওরা নিজেদের আস্তানার দিকে যাচ্ছে। ওরা যদি সত্যি মানুষ খেকো হয় তাহলে তাদের কবল থেকে আমরা সমরবাহুকে উদ্ধার করতে পারব না।” জীবদত্ত বলল।

স্বর্ণাচারি পাহাড়ের নিচের বনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল আদিবাসীদের। সমরবাহুকে দেখেই সে বিচলিত হয়ে বলে উঠল, “দেখুন আপনারা যে কোন ভাবে ওদের কবল থেকে সমরবাহুকে উদ্ধার করুন। ঐ ভালুক নাচানো আর বনে বাদারে ঘুরে বেড়ানো নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোকের মধ্যে সমরবাহু বেশিদিন বাঁচতে পারবে না। আমার মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করতে না পারলে সমরবাহুর জীবন বিপন্ন হতে পারে।”

“স্বর্ণাচারি, তোমার অনুরোধে আমরা সমরবাহুকে বাঁচানোর চেষ্টা করব। ঐ আদিবাসীদের অনুসরণ করে ওদের খপ্পর থেকে সমরবাহুকে উদ্ধার করতে একটু সময় লাগবে। এর মধ্যেই ওরা সমররাহুকে মেরে ফেললে সেটা তার দুর্ভাগ্য মনে করতে হবে।” জীবদত্ত বলল।

আপনাদের উদ্ধার কাজ যাতে তাড়াতাড়ি হতে পারে তার জন্য সমরবাহুর দলের কয়েকজনকে আপনাদের সঙ্গে পাঠাচ্ছি। ওদের এই অঞ্চলে মেরে ফেলে সমরবাহুকে উদ্ধার করুন।” স্বর্ণাচারি নিবেদনের সুরে বলল।

স্বর্ণাচারি ভূত-ভবিষ্যত কিছু না ভেবে কথা বলায় জীবদত্ত হেসে উঠে বলল, “স্বর্ণাচারি ঐ পাজী লোকগুলোকে মেরে

ফেলা অত সহজ কথা নয়। আমরা ওদের উপর হামলা করতে যাচ্ছি টের পেলে ওরা তৎক্ষণাৎ সমরবাহুকে বধ করবে। ...তাই বলে আমরা যে দেরি করতে চাই তা নয়, আমরা এক্ষুনি বেরুচ্ছি। আমরা ওকে মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব।" জীবদত্ত বলল।

তারপর খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত পাহাড় থেকে নেমে বনের দিকে এগিয়ে গেল। ওরা আদিবাসীদের দেখতে পেলনা বটে কিন্তু ওদের ডমরু প্রভৃতি নানান ধরণের বাজনার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল।

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত ঠিক করল পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি ওদের কাছাকাছি চলে যাবে। পিছন দিক থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করে ওদের পর্যুদস্ত করে ফেলবে। কিন্তু গাছের ফাঁক দিয়ে ওদের কখন দেখা যাচ্ছিল আবার কখন ওরা গাছের আড়ালে পড়ে যাচ্ছিল।

"খড়্গবর্মা, ভালুকের চামড়া পরা লোকগুলোকে ওদের আস্তানায় গিয়েই আক্রমণ করতে হবে। এছাড়া উপায় নেই। এই ঘন বনে এদের আক্রমণ করে ঠিক সুবিধা করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।" জীবদত্ত নিরাশ হয়ে বলল।

খড়্গবর্মা জীবদত্তের কথার জবাব দিতে যাবে এমন সময় ওরা আর ঐ বাজনার আওয়াজ শুনতে পেল না। সমস্ত বনে সে এক কঠিন নীরবতা।
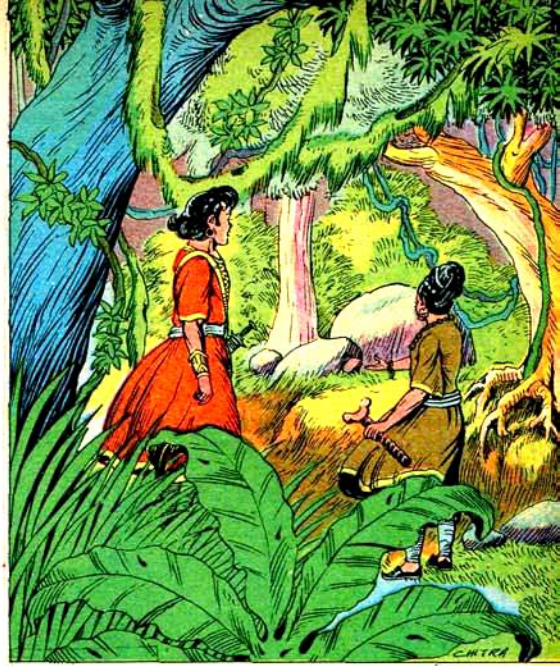
"খড়্গবর্মা, এ কি! মনে হচ্ছে যেন কোন এক রাক্ষস এক সঙ্গে সমস্ত আদি-বাসীদের যেন গিলে ফেলেছে। কোন সাড়া নেই, কোন শব্দ নেই। হল কি?" জীবদত্ত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল।

"কেমন যেন গোলমেলে লাগছে সব কিছু। এতক্ষণ আওয়াজ শুনে শুনে আমরা ওদের অনুসরণ করছিলাম। কিন্তু এখন, আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না, এগোবো কোন দিকে? আর না এগোলে ওদের ধরব কি করে? মারব কি করে? আর সমরবাহুকে উদ্ধারই বা করব কি করে? আমি তো

কিছুই ভেবে পাচ্ছি না ” খড়্গবর্মার প্রশ্নে উদ্বেগ প্রকাশ পেল।

ঠিক সেই সময় কাছের গাছের আড়াল থেকে নেকড়ের ডাক শোনা গেল। তাদের আর্তনাদ শুনে জীবদত্ত বলল, “এ তো তাজ্জব ব্যাপার। দিন দুপুরে এই ধরণের নেকড়ের ডাক, কি ব্যাপার! নিশ্চয় কিছু ঘটেছে।” বলতে বলতে জীবদত্ত ঐ গাছের দিকে এগিয়ে গেল।

গাছের কাছে গিয়ে দেখে ঐ গাছের ডালগুলো নুয়ে আছে। তাদের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওরা দেখতে পেল দূরের সবুজ ক্ষেত। চাষ আবাদ করা ক্ষেতের মত দেখাচ্ছিল ঐ ক্ষেত। অন্যান্য গাছের ডালে ডালে ফলের বাহার। কিন্তু জীবদত্ত বা খড়্গবর্মার কাছে ওসব বিশেষ আকর্ষণের বস্তু নয়। নজরে পড়ল চারজন লোক ক্ষেতে জল ঢালছে। ভালুকের চামড়া পরা বাকি দুজন গাছের নিচে দুটো ভেড়া নিয়ে বসে আছে। এখন তারা গোটা ব্যাপার অনুমান করতে পারল।

“খড়্গবর্মা, ভালুকের চামড়া পরা লোকগুলো বনের কিছুটা জমিতে চাষ আবাদ করছে। ওরা যাদের দিয়ে ক্ষেতের কাজ করাচ্ছে তাদের অন্য জাতের লোক মনে হচ্ছে। হয়ত ওরা এই চামড়া পরা লোকগুলোর গোলাম।” জীবদত্ত বলল।

“তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনে হচ্ছে ঐ মানুষগুলোকে পাহারা দেবার জন্যই নেকড়ে রাখা হয়েছে। সমরবাহুকে বেঁধে একদল নিয়ে গেছে অন্য কোথাও।” খড়্গবর্মা বলল।

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত এই সব কথা বলাবলি করছিল। আর তখনই ওরা দেখতে পেল ক্ষেতের গাছের আড়ালে আড়ালে নুয়ে হাঁটতে হাঁটতে একজন এগিয়ে যাচ্ছে। ভালুকের চামড়া পরাদের একজনের ঘুম পেয়েছিল। সে একটি গাছের নিচে বসে ঘুমে ঢুলে ঢুলে পরছিল। তা লক্ষ্য করে জীবদত্ত খড়্গবর্মাকে বলল, “খড়্গবর্মা, মনে হচ্ছে ঐ লোকটা ভালুকের

চামড়া পরা ঝিমোনো লোকটাকে শেষ করার তালে আছে। দেখতে পাচ্ছ ওর চলা··· ।" জীবদত্ত হঠাৎ চুপ হয়ে গেল।

গোলাম পাহারাদারের পিছনে ছিল। জলপাত্র থেকে একটা পাথর তুলে পাহারাদারের মাথায় আঘাত করল। পাহারাদার আঘাতের চোটে জোরে আর্তনাদ করে উঠল। পরক্ষণেই সামনের দিকে তার মাথা ঝুঁকে পড়ল। গোলাম এক দৌড়ে বনে ঢুকে গেল।

সাথীর অবস্থা দেখে অন্য পাহারাদার গোলামকে ধরার জন্য তার পেছনে ধাওয়া করল। নেকড়েগুলোকেও তার দিকে লেলিয়ে দিল। নেকড়ে দুটো ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে ঐ গোলামের পিছু ধেয়ে গেল। আর নেকড়ের পেছনে ছুটতে লাগল ঐ পাহারাদার।

"খড়্গবর্মা, সমরবাহুর কপাল ভাল যে আমরা এদিকে এসেছি। তিনটে গোলাম এখানেই রয়ে গেছে। আমরা তো ঐ গোলামদের কাছ থেকে ভালুকের চামড়া পরা লোকদের আস্তানা কোথায় জেনে নিতে পারি।" একথা আলোচনা করতে করতে জীবদত্ত ক্ষেতের গাছের আড়ালে ভয়ে ভয়ে দাঁড়ানো সেই লোকগুলোকে জোরে ডাকল।

জীবদত্তের ডাক শুনে গোলামরা চমকে উঠল। খড়্গবর্মা হাত তুলে ওদের ইশারা

করে কাছে ডাকল। পরক্ষণেই ঐ তিনজন গোলাম এক সঙ্গে বনের দিকে ছুটে পালাল।

জীবদত্ত হো হো করে হেসে উঠে বলল, "খড়্গবর্মা, মনে হচ্ছে আমরা পথ ভুলে এই পাগলদের মধ্যে এসে পড়েছি। পাহারাদার একজন গোলামের পিছনে ধাওয়া করে চলেছে। এদের পাহারা দেবার কোন লোক নেই তবু এরা এমন ভাবে জল তুলছে যেন কিছুই হয়নি এখানে। আমাদের দিকে ঐ তিনজন এমন ভাবে তাকাল যেন ভূত দেখছে!"

এখন আমরা কি করব? পালানো গোলামকে ধাওয়া করবো? নেকড়ের গর্জন শুনতে পেয়েছ তো? এবার চল এগিয়ে দেখি সমরবাহুকে যারা বেঁধে নিয়ে গেল সেই ভালুক চামড়াধারীদের দেখা পাই কিনা। ওদের সন্ধান পেলেও পেতে পারি।" খড়্গবর্মা বলল।

তারপর খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত দুজনে বনে ঢুকল। যে দিকে নেকড়ের গর্জন শোনা যাচ্ছিল সেই দিকে ওরা গেল। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর ওরা ডমরু ও অন্য ধরণের বাজনার আওয়াজ শুনতে পেল। দুজনে ওদিকে তাকাল। দূরে দেখতে পেল কালো ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশ যেন ছেয়ে ফেলেছে।

"খড়্গবর্মা মনে হচ্ছে ভালুক চামড়াধারী লোকগুলো সমরবাহুকে নিয়ে মারাত্মক কিছু একটা করে ফেলবে। ওরা আগুন ধরাচ্ছে কেন? সমরবাহুকে পুড়িয়ে ফেলবে না তো?" জীবদত্ত জিজ্ঞেস করল।

"হয়ত পোড়াবে। আমাদের আরও জোরে পা চালিয়ে যাওয়া উচিত।" একথা বলে খড়্গবর্মা খাপ থেকে তরবারি বের করল। তারপর ওরা দুজনে ঐ আগুন আর ধোঁয়ার দিকে এগিয়ে গেল।

(আরও আছে)

পরিবর্তন

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য ঐ গাছের কাছে ফিরে গেলেন। গাছ থেকে শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে চুপচাপ শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, আমি জানিনা কিসের আশায় এই মাঝ রাতে তুমি এত পরিশ্রম করছ। এই পৃথিবীতে কিন্তু বিনা কারণেই বন্ধু শত্রু হয়ে যায় আবার শত্রু বন্ধু হয়। আমার বক্তব্য বুঝতে পারবে একটি কাহিনী শুনে। গল্প শুনলে তোমার পরিশ্রমও কমতে পারে।

বেতাল কাহিনী শুরু করল ঃ বিক্রমপুরের রাজা বিক্রমবর্মা শাসন কাজে খুব দক্ষ ছিল। প্রজাদের সুখ সুবিধার দিকে খুব নজর ছিল তার। ফলে তার উপর প্রজাদের ছিল অগাধ বিশ্বাস। রাজার

বেতাল কথা

ছিল অনেক উপজাতি। তারা থাকত ছোট ছোট দলে। অনেকগুলো অঞ্চলে ভাগ হয়ে থাকত তারা। তারা শান্তিতে নিজেরা নিজেদের মত বাস করত। এক দিন দেবরাজ গোপনে বনের উপজাতির দলের নেতাদের ডেকে পাঠিয়ে তাদের বলল, "তোমরা যে ভাবে আছ তা দেখে আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। বনের জানোয়ারও এত কষ্ট করে থাকে না। বিক্রমপুর স্বর্গের মত একটা দেশ। তোমরা সবাই জোট বেঁধে ঢুকতে পার না বিক্রমপুর রাজ্যে? তোমাদের বাধা দেবার ক্ষমতা আছে ঐ বিক্রমবর্মার? ওর শক্তি কতটুকু!

আদেশে, এমন কি, তারা আগুনে ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত ছিল।

রাজা বিক্রমবর্মার এই সুখ্যাতি পাশের দেশের রাজা দেবরাজের কাছে অসহ্য ছিল। দেবরাজের প্রজারা তার উপর রেগে ছিল। তারা বিক্রমবর্মাকে প্রশংসা করত। কারণ তারা দেবরাজের অত্যাচারের জ্বালায় জর্জরিত ছিল। দেবরাজ যুদ্ধ করে বিক্রমবর্মাকে হারাতে পারে না। বিক্রমপুরে যতদিন না অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ছে ততদিন সে বিক্রমবর্মাকে পরাস্ত করতে পারে না।

অনেক ভেবে দেবরাজ একটা চক্রান্ত করল। দেবরাজ এবং বিক্রমবর্মার রাজ্যের মাঝে অনেক ঘন বন ছিল। সেই বনে

তোমরা ইচ্ছে করলে হেলায় বিক্রমপুর থেকে ধন সম্পত্তি লুঠ করে আনতে পার। বিক্রমপুরের সেনারা যদি তেমন আক্রমণ করতে আসে, তোমাদের ভয় কি? তোমরা চলে আসবে আমার রাজ্যে। আমি তোমাদের আশ্রয় দেব। আর দেরি নয়। এবার তোমরা যাও। আক্রমণ কর বিক্রমপুর। খেয়ে পরে আনন্দে থাক। মানুষের মত বাঁচতে শেখ।"

দেবরাজের কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে বনের বাসিন্দারা বিরাট বাহিনী গঠন করে বিক্রমপুর আক্রমণ ও লুঠ করতে লাগল।

বিক্রমবর্মা তার দেশের উপর আক্রমণ যে পরিকল্পিত ভাবে হচ্ছে তা লক্ষ্য

করল। লুণ্ঠনকারীদের ধরার ভার দিল প্রজাদের উপর। জনতা লুণ্ঠনকারীদের ধরার উদ্যোগ নিল। রাতদিন পাহারা দিতে লাগল। বহু লুণ্ঠনকারীকে ধরল। জনতা যাদের ধরল বিক্রমবর্মা তাদের দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করে ফাঁসি দিল।

তারপর রাজা বিক্রমবর্মা বনের ঐ অধিবাসীদের কাছে খবর পাঠাল, "আমি তোমাদের স্বাধীনতায় কোন দিন হস্তক্ষেপ করিনি, করব না। তোমরা ইচ্ছে করলে আমার রাজ্যে এসে বাস করতে পার। কিন্তু যদি চুরি করতে আস তাহলে ফাঁসি দেব।"

যে লুণ্ঠন শুরু হয়েছিল তা ঘোষণার পর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। দেবরাজ আশা করেছিল বিক্রমপুরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। বনের অধিবাসীরা বিক্রমবর্মার ঘোষণা সঠিক বলে গ্রহণ করল।

কিন্তু ওদের মধ্যে একজন অন্য কথা মনে মনে ভেবে রাখল। তার নাম ভীম। বিক্রমপুরের কাছাকাছি একটা বনে ভীম আর তার দাদা রাম বাস করত। রাম বনের আর দশজন অধিবাসীদের সঙ্গে মিলে মিশে থেকে ওদের মতই কাজ করে জীবন যাপন করত। ভীম কাঠ কাটত আর সেই কাঠ বিক্রমপুরে বিক্রি করে পয়সা কড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরত। ফলে শহরের জীবনের সাথে সে ভালভাবেই পরিচিত ছিল। শহরের বেশ কিছু লোকের সাথে তার

চেনা জানা এমন কি বন্ধুত্বও হয়ে গিয়েছিল। বিক্রমপুরে যারা লুণ্ঠন করতে গিয়েছিল তাদের দলে ছিল রাম। অন্যদের মত সেও ধরা পড়েছিল। ফলে তার ফাঁসি হল। ভীমের কাছে ব্যাপারটা ভীষণ খারাপ লাগল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, যে রাজা তাকে ফাঁসি দিয়েছে তাকে বধ করে তার দাদার আত্মাকে শান্তি দেবে।

প্রতিবেশী রাজা দেবরাজও বিক্রমবর্মাকে শেষ করে ফেলবে ঠিক করল। সে বুঝতে পারল যে কোন ক্রমে বিক্রমবর্মার রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তারপর সে একটা ছোট সেনা বাহিনীকে বিক্রমবর্মা যে বনে শিকার করে সেই বনে পাঠিয়ে দিল। সৈনিকদের কাজ হবে বিক্রমবর্মার অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসে থাকা। একদিন বিক্রমবর্মা সদলে শিকার করতে ঐ বনে এল। দেব-রাজের সেনারা বিক্রমবর্মার দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঐ সেনাদের নেতা বিক্রম-বর্মাকে আক্রমণ করল। উভয় পক্ষের তরবারি যুদ্ধ হল অনেকক্ষণ।

বিক্রমবর্মার শিকার করতে বনে আসার খবর ভীমও পেয়েছিল। সেও তীর ধনুক নিয়ে বনের ঐ জায়গায় পৌঁছে গেল। সেখানে গিয়ে দেখে বিক্রমবর্মা তরবারি যুদ্ধে মেতে রয়েছে। তখন সেই যুদ্ধ কিছু-ক্ষণ দেখে বিক্রমবর্মার দিকে তাক্ করে ভীম তীর ছুঁড়ল। কিন্তু সেই তীর লাগল গিয়ে বিক্রমবর্মার সঙ্গে যুদ্ধরত সৈন্য বাহিনীর নেতার গায়ে। সে তক্ষুনি মারা গেল। নেতার মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখে দেবরাজের সেনারা ছুটে পালাল।

বিক্রমবর্মা ভাবল ভীম সেনা-নেতাকে তাক্ করেই তীর ছুঁড়েছে। তাই সে ভীমের কাছে তার উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাল। ভীমকে নিজের সঙ্গে রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে নিজের দেহরক্ষক করে নিল। ভীম মনে মনে ভাবল দেহ-রক্ষকের চাকরি নিলে ভালই হবে। বিক্রমবর্মাকে বধ করা খুব সহজ হবে। একথা ভেবে ভীম দেহরক্ষকের চাকরি নিল!

দেবরাজ যখন দেখল যে তার দ্বিতীয় চালও খাটল না তখন সে আর একটা চক্রান্ত করল। সে বিক্রমবর্মার সেনাপতির কাছে গোপনে দূত পাঠাল। দূত ঐ সেনাপতিকে বলল, "আপনি বিক্রমবর্মাকে বধ করলে আপনাকে বিক্রমপুরের রাজ-সিংহাসনে বসাব। বিক্রমবর্মার মারা যাওয়ার পর যদি দেশবাসী বিদ্রোহ করে তখন সেই বিদ্রোহ আপনার এবং আমার সেনারা একযোগে দমন করবে। আপনাকে সিংহাসনে বসানোর পর দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হবে।"

রাজা হওয়ার লোভ পেয়ে বসল বিক্রমবর্মার সেনাপতির। দেবরাজের টোপ সে চমৎকার খেল। ঠিক করল নিজের রাজাকে বধ করবে। একদিন রাত্রে রাজার শোওয়ার ঘরে সেনাপতি গিয়ে জরুরী কথা সারতে চাইল। রাজা সরল বিশ্বাসে সেনাপতির সাথে কথা বলতে বসল।

ভীমও বিক্রমবর্মাকে বধ করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কিছুতেই ঠিক সুযোগ পাচ্ছিল না। শেষে সে ঠিক করল শোওয়ার ঘরেই রাজাকে হত্যা করবে। তকে তকে ছিল ভীম। সেনাপতির রাজার শোওয়ার ঘরে ঢুকে বেরুতে দেরী হচ্ছে দেখে ভীমও পা টিপে টিপে ঢুকল। একবার রাজাকে যে লোকটা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে তার অঙ্গরক্ষকের পদ পেয়েছে

তাকে আটকাতে সাহস করেনি ঐ ঘরের পাহারাদার।

বিক্রমবর্মার শোওয়ার ঘরে ঢুকেই ভীম চমকে উঠল। সে দেখতে পেল রাজা সেনাপতির হাত শক্ত করে ধরে রয়েছে। সেনাপতির হাতে মস্ত বড় ছোরা। সেটা-কেই সুবর্ণ সুযোগ ভেবে ভীম তরবারি ছুঁড়ে দিল রাজার দিকে। কিন্তু তরবারি সোজা বিঁধল গিয়ে সেনাপতির বুকে।

রাজা ভীমকে আন্তরিক ভাবে প্রশংসা করল। পরের দিন তাকে নতুন সেনাপতির পদে নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করল।

এই ঘটনার পর ভাইকে ফাঁসি দেওয়ার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে ভীমের মন থেকে একেবারে লোপ পেল। ক্রমে ভীম রাজার অত্যন্ত বিশ্বাসী ভক্তে রূপান্তরিত হল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, ভীম প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা কেন পালন করল না? কারণটা কি এই যে রাজা তাকে উচ্চ পদে বসিয়েছিল? না কি রাজার প্রতি ঈশ্বরের অপার করুণা ছিল। এই প্রশ্নের সমাধান জানা সত্ত্বেও না বললে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

এ কথায় বিক্রমাদিত্য বললেন, "ভীমের মনে পরিবর্তন আসার কারণ এগুলো নয়। আস্তে আস্তে ভীম বুঝেছিল তার দাদা রামকে ফাঁসি দেওয়া রাজার ইচ্ছে ছিল না। রাজার একমাত্র লক্ষ্য ছিল রাজত্ব রক্ষা করা। এমন কি বনের অধিবাসীরাও বলেনি যে রাজা ফাঁসি দিয়ে অন্যায় কাজ করেছে। অতএব, মানতেই হবে যে রাজার কাজের প্রতি কারো মনে অবিশ্বাস জাগেনি। ভীমের মনেও সেই বিশ্বাসই দানা বেঁধে উঠতে লাগল।

রাজার এই ভাবে মৌন ভাব ভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ঝুলে পড়ল ঐ গাছে। (কল্পিত)

ক্ষমতা

পণ্ডিত জগন্নাথ রায় বাদশাহ শাজাহানের দর্শন পাওয়ার আশায় দিল্লী গেলেন। দরবারের সামনে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে লাগলেন।

জগন্নাথ রায় যে আস্তানায় উঠেছিলেন সেখানে দুজন মেয়েছেলে চুলোচুলি করে একদিন ঝগড়া করছিল। ওদের ঐ অবস্থায় ধরে ছাড়িয়ে সেপাইরা ঝগড়ার কারণ জিজ্ঞেস করল।

"এই আমাকে আগে গালাগাল দিয়েছে।" দুজনই বলল।

"তোমাদের ঝগড়া আগাগোড়া কেউ দেখেছে।" সেপাইরা ওদের জিজ্ঞেস করল।

ওরা পণ্ডিত জগন্নাথ রায়কে দেখিয়ে দিল।

সেপাইরা ওদের তিনজনকে নিয়ে গিয়ে বাদশাহের সামনে হাজির করল।

মেয়েরা উর্দু ভাষায় পরস্পরকে গাল দিয়েছিল। পণ্ডিত জগন্নাথ শুধু সংস্কৃত ও বাংলা জানতেন। উর্দু জানতেন না। তবু ঐ দুজন যা যা বলেছিল জগন্নাথ হুবহু বলে গেলেন। বাদশাহ অবাক হয়ে শুনলেন।

দরবারের সবাই অবাক হয়ে গেল। জগন্নাথ রায়ের মনে রাখার ক্ষমতা দেখে প্রসন্ন হয়ে বাদশাহ তাঁকে দরবারী কবি হিসেবে নিযুক্ত করলেন।
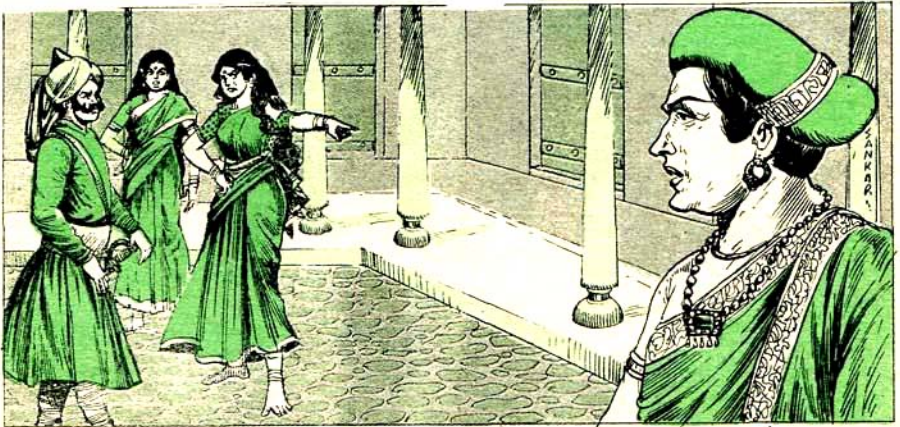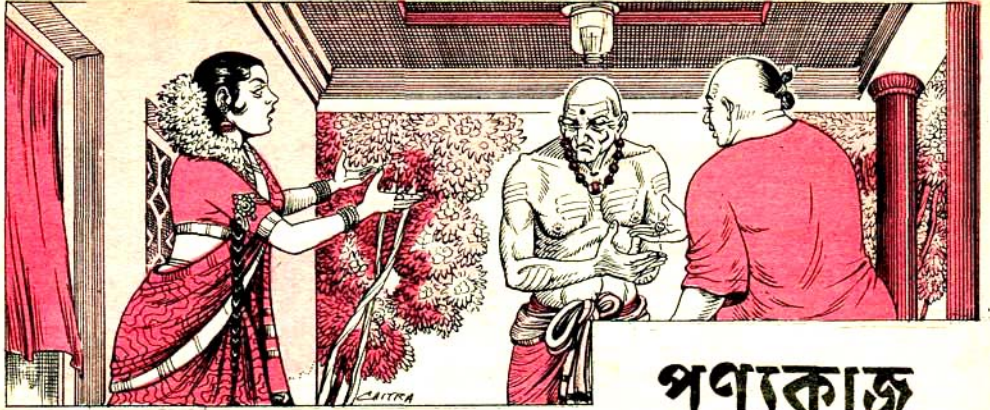
পুণ্যকাজ

প্রাচীনকালে অক্ষরপুরে এক বড় ব্যবসাদারের নাম ছিল ধর্মপাল। তার স্ত্রীর নাম সুলক্ষণা। তাদের ছিল পাঁচটি পুত্র। ব্যবসায় অনেক অর্থ উপার্জন করায় তারা তুলসী, অশ্বত্থ ও আমলকী বৃক্ষে পূজা দিত। ধর্মপাল ও তার স্ত্রী প্রত্যেক দিন কোন না কোন গরীবকে সোনার আমলকী দান করে অন্ন জল গ্রহণ করত। বড় ছেলের বিয়ের পর বড় বউ শাশুড়ীকে সোনার আমলকী দান করতে বারণ করে বলল, "মা, আপনি প্রত্যেক দিন একটা করে সোনার আমলকী দান করলে তো আর কিছুই থাকবে না। আপনি বরং রুপোর আমলকী দান করলেই পারেন।"

ঐ বৃদ্ধ দম্পতি বউমার কথা মত রুপোর আমলকী দান করতে লাগল।

তারপর মেজ ছেলের বিয়ে হল। মেজো বউ শাশুড়ীকে বুঝিয়ে বলল, "মা, প্রত্যেক দিন এভাবে রুপো দান করলে ছেলেদের ভবিষ্যতের জন্য কিছুই থাকবে না। তামার আমলকী দান করলেই পারেন।"

বুড়ো বুড়ি, এই বয়সে ছেলে আর বউমাদের সাথে তর্ক বিতর্ক করা নিষ্প্রয়োজন ভেবে ঠিক করল তামার আমলকী দান করবে।

সেজো ছেলের বউ এল। সেজো বউ অনুরোধ করল, "মা, বাড়ির যা অবস্থা দেখছি তাতে আমি ভয় পাচ্ছি। রোজ একটা করে তামার আমলকী খরচ করলে ছেলে বউদের জন্যে রেখে যাবেন কি! লোহার আমলকী দান করতে পারেন!"

ব্যবসাদার ও তার স্ত্রী একথার পিঠে আর কোন কথা বলল না। চুপ করে

দেব ভট্টাচার্য

গেল। প্রত্যেক দিন একটা করে লোহার আমলকী দান করে যেতে লাগলেন।

তারপর চতুর্থ বউ এল। সেই বউ প্রত্যেক দিন শাশুড়ীকে দান করতে দেখে তো অবাক! সে বলল, "মা, যত লোহা দান করছেন তত লোহা বিক্রী করলে ব্যবসার অনেক উন্নতি হত। ছেলে বউদের জন্যে কিছু রেখে যেতে পারতেন। অতই যদি দান করার ইচ্ছে থাকে তো আটার আমলকী দান করলেই পারেন।"

তাই মেনে নিল বুড়োবুড়ি। আটার আমলকী দান করে যেতে লাগল।

অবশেষে ছোট বউ এসে তাও দান করতে বারণ করে দিল। তারপর আর বুড়োবুড়ি পারল না ঐ বাড়িতে থাকতে। রওনা দিল তীর্থ করার অজুহাতে।

আসল ব্যাপার ছেলেরা কুঁড়ে হয়ে গিয়েছিল। নিজস্ব উদ্যোগে রোজগার করার কোন চেষ্টা তাদের ছিল না। বাপের রোজগার বসে খাওয়ার ইচ্ছাই প্রবল ছিল। বিনা পরিশ্রমে যে খায় তার হজম হয় না। মনে কুচিন্তা ঢোকে। ফলে একদিন সমস্ত সম্পত্তি শেষ হয়ে যায়।

ওদিকে বুড়োবুড়ি সরযূ নদীর তীরে এক জায়গায় বাস করতে লাগল। ধর্মপাল ঐ আমলকী দিয়ে নানা ধরণের ওষুধ বানিয়ে বিক্রি করে টাকা রোজগার করতে লাগল। ব্যবসা বেশ জমে উঠল। আবার

ঐ বুড়োবুড়ি দান ধর্ম করতে শুরু করে দিল। যত দান করে তত অবস্থা ভালর দিকে ফেরে। ধর্মপাল নিজের থাকার জন্য একটি বাড়ি বানালো। মন্দির তৈরি করানোর ব্যবস্থা করল সরযূ নদীর তীরে। এদিকে ধর্মপালের ছেলেদের আর তাদের বউদের অবস্থা দিনকে দিন পড়ে যেতে লাগল। তাদের দুবেলা খাবার জুটতো না। শেষে নিজেদের দিন মজুরীর কাজ করতে হল। এখানে ওখানে কাজ করতে করতে অবশেষে তারা সরযূ নদীর তীরে পৌঁছাল। ঐ মন্দির গড়ার কাজে ছেলেরা আর পাঁচ জনের পাঁচ বউ কাজ করতে লাগল ঐ মন্দিরের জন্য।

মন্দিরের মালিক দান করছে শুনে পাঁচ ছেলে আর বউরা গেল মালিকের বাড়ি। জানালা দিয়ে সুলক্ষণা ছেলে বউদের দেখে ডাকল। পাঁচ ছেলে-বউদের অবস্থা দেখে সুলক্ষণার বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

সুলক্ষণা ভাবল বউমাদের উচিত শিক্ষা দেবার এই হল সুবর্ণ সুযোগ। সে একটি রুপো, তামা, লোহা ও আটার আমলকী বানিয়ে বাইরে এল। ওদের না চেনার ভান করে বড় বউয়ের হাতে রুপোর আমলকী দিল। মেজোর হাতে তামার আমলকী এবং সেজোর হাতে লোহার আমলকী ও চতুর্থ বউয়েয় হাতে আটার আমলকী দিল। তারপর ছোট বউয়ের কাছে এসে বলল, "তোমায় দেবার মত কিচ্ছু নেই!"

ততক্ষণে বউরা বুঝতে পেরে শাশুড়ীর পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। শাশুড়ী তাদের ক্ষমা করে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল। ধর্মপালও ছেলেদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে চান করিয়ে পোশাক পরিয়ে তাদের খেতে দিল।

তারপর থেকে ছেলে বউ শ্বশুর শাশুড়ী সবাই একত্রে থাকতে লাগল। প্রত্যেকে পরিশ্রম করে ব্যবসা বাড়াতে লাগল। দান ধর্মও করতে লাগল।

বেগার খাটা

কয়েক বছর আগের কথা। হাঙ্গেরীর রাজা প্রজাদের বেগার খাটাত। একবার একটা বিরাট জলাশয় খোঁড়ার জন্য দেশের লোককে ডাকল। সবাইকে কোদাল নিয়ে হাজির হতে হল।

দুপুরে সমস্ত লোক খেতে বসেছিল। এমন সময় পথিক এসে তাদের বললেন, "প্রত্যেকে একটা করে মুদ্রা দিলে আর বেগার খাটতে হবে না।"

একথা শুনে প্রত্যেকে একটা করে মুদ্রা তাকে দিল।

"না, একটা হলে চলবে না। দুটো করে দিতে হবে।" পথিক বললেন। লোকগুলো বিরক্ত হয়ে আবার একটা করে মুদ্রা দিয়ে দিল।

"না। এও যথেষ্ট নয়। আর একটা করে দিতে হবে।" পথিক আবার বললেন।

তার কথা শুনে বিরক্ত হয়ে রেগে গিয়ে কোদাল তুলে পথিককে মারতে গেল।

"ঠিক এই ভাবে যেদিন তোমরা সত্যি সত্যি মারতে পারবে সেই দিনই তোমাদের বেগার খাটার দিন শেষ হবে। নাও যে যা দিয়েছ ফেরৎ নাও।" মুদ্রাগুলো ফেরৎ দিয়ে পথিক ফিরে গেল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে হাঙ্গেরীর মানুষ বিদ্রোহ করে বেগার খাটার এই ব্যবস্থা রদ করাল।

কাঠেরঘোড়া

চার

কামর-অল-আকমর দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে অবশেষে এল সানা নগরে। রাজপ্রাসাদে নেমে চেনা পথে হাঁটার মত হেঁটে রাজকুমারীর শোওয়ার ঘরে ঢুকল।

পাহারাদার যথারীতি নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিল। দাসদাসীরা রাজকুমারীর চার দিকে ছড়িয়ে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল।

তারপর পর্দা সরিয়ে কামর লক্ষ্য করল তার প্রেয়সী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। তার সাথীরা রাজকুমারীকে নানা কথা বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। প্রেমিক তাকে হয়ত ভুলে গেছে বলে জানাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ রাজকুমারী দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, "আমার প্রেমিক, আমার কামর আমাকে কোনদিন কোনক্রমেই ভুলতে পারে না। এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। তোমরা আর আমাকে ওকথা বলোনা।" শুনে আনন্দে কামর-অল-আকমরের দমটা যেন বন্ধ হয়ে আসতে চায়। নাহার এমন ভাবে নিজেকে আর কোনদিন প্রকাশ করেনি।

কামর ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ প্রেয়সীর দিকে তাকিয়ে বলল, "এত কাঁদছ কেন?" কেঁদো না লক্ষীটি।" রাজকুমারী তাড়াতাড়ি উঠে কামরকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না।"

রাজকুমার তখনই বলে উঠলেন, "তাহলে এক কাজ করা যাক, তুমিও আমার সঙ্গে চলো। আমার সাথে আমার দেশে নিয়ে

যাব। সেখানে নিয়ে গিয়ে বাবাকে সব কথা জানিয়ে তোমাকে আমি বিয়ে করব। আমি বাবার একমাত্র ছেলে। বাবা আমার কথায় 'না' বলবেন না। আর 'না' বলবেনই বা কেন, তোমার মত রত্ন পেলে তিনি মাথায় করে রাখবেন।"

এরপর রাজকুমারীর কান্না একটু থামল। রাজকুমারী বলল, "বাবা-মাকে ছেড়ে যেতে আমার খুবই কষ্ট হবে, কিন্তু তোমায় ছেড়ে থাকতে হলে আমি বাঁচবই না।"

তাহলে তাই করা যাক, "তুমি চল আমার সঙ্গে।" রাজকুমার বলল।

"এত খিদে পেয়েছে যে বলার নয়। আগে কিছু খাই তার পরের কথা পরে।" কামর বলল। দাসীদের বলে রাজকুমারী খাবার আনাল।

রাজকুমারী বলল, "তোমার ঘোড়া তুমি ঠিক চালাতে পারবে? কোন ভুল হবে না তো?"

"না গো না, যে শিল্পী ঐ ঘোড়া তৈরি করেছে তার চেয়েও ওর অন্ধি সন্ধি আমি এখন ভাল জানি।" রাজকুমার জবাবে বলল।

সেই দিন শেষ রাতে রাজকুমারী বাবা-মার জন্য দু'চার ফোঁটা চোখের জল ফেলল। গভীর প্রেমে অনেক আনন্দের আশা নিয়ে কামর-অল-আকমরের সাথে
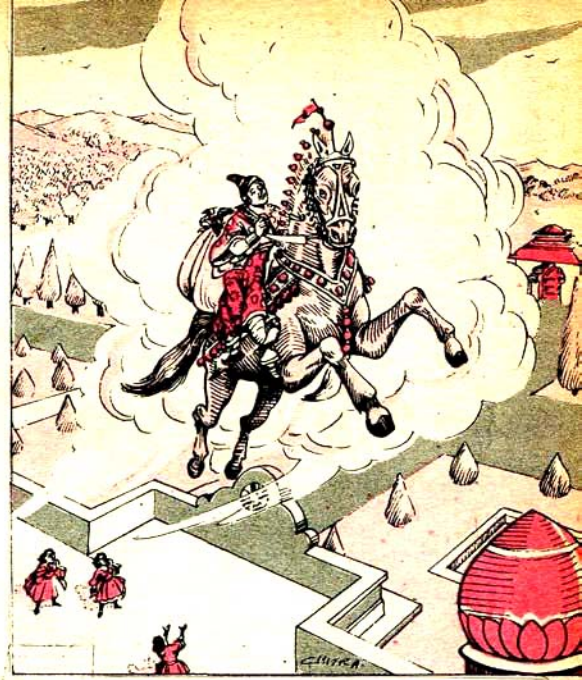
জাদু-ঘোড়ায় চড়ে আকমরের দেশ পারস্যে রওনা হল।

সারাদিন ঘোড়া চালিয়ে দুপুরের কাছাকাছি রাজকুমার পারস্যের রাজধানী সিরাজে এল। প্রাসাদে আর নিয়ে গেলো না রাজকুমারীকে। নিয়ে গেলো বাপের এক বাগান বাড়িতে। সামনেই পদ্মভরা দীঘি, আর আশে পাশে ফুলের বাগান। মালী, রাঁধুনী, খোজা প্রহরী সবই আছে সেখানে। ঘোড়াটাও রইল ওখানে, আকমর হাঁটতে হাঁটতে রাজকুমারীকে বলে গেল, "বাবার কাছে গিয়ে বিয়ের কথাটা আগে বলি, তাছাড়া তোমার উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে প্রাসাদে নিয়ে যেতে হবেত। একটুও ভয়

পেয়োনা তুমি, খোজা প্রহরী আছে। শীগগিরই সৈন্যসামন্ত নিয়ে শোভাযাত্রা করে বাবা তোমায় নিতে আসবেন। আমি জানি বাবা খুশী হবেন।"

রাজকুমারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কামর-অল-আকমর যখন প্রাসাদে এল তখন তাকে দেখে আনন্দের রোল পড়ে গেল। বাদশা সাবুর ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মা এসে ছেলের কপালে চুমু খেয়ে বললেন, "বাবা, তুই আমাদের ফেলে এতদিন কোথায় ছিলি!" বোনেরা ছুটে এসে আনন্দে লাফাতে লাফাতে বলল, "দাদা এসেছে, দাদা এসেছে!" বলে আনন্দে চোখের জল ফেলতে লাগল।

কামর-আল-আকমর তখন সব ঘটনা বাবাকে খুলে বলে রাজকুমারীর গুণ সবিস্তারে বর্ণনা করে বলল, "বাবা, আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। আপনার অনুমতি পেলে তাকে আমি প্রাসাদে নিয়ে আসব। তারপর আমার ইচ্ছে আমি তাকে আমার জীবনসঙ্গিনী করি।"

সব শুনে বাপ আবার ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তোকে আর যেতে হবে না বাবা! আমিই যাচ্ছি, শোভাযাত্রা করে তাকে আনতে। যে তোকে এত সেবাযত্ন করেছে তুই নিজে না আনলে আমিই তার পিতার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ঘটক পাঠাতাম।

পিতার নিজেরই এ বিয়েতে মত আছে জেনে কামর-অল-আকমর মহা খুশী।

সাবুর বললেন, "আমার নিজেরই দেরি সইছে না। আজই তোকে আমি এ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব।"

সিরাজে তখন উৎসবের ধুম পড়ে গেল। চারিদিকে সাজ সাজ রব। বাদশা উজিরকে ডেকে শোভাযাত্রার আয়োজন করতে হুকুম দিলেন। কনেকে আনবার জন্য সাদা জরির ঢাকনা-দেওয়া চতুর্দোলা সাজানো হতে লাগল। রাজপথ আর বাড়িঘর সব ফুল ও আলো দিয়ে সাজানোর আয়োজন চলতে লাগল।

ছেলে ফিরে আসার আনন্দে রাজকারা- গারে যত বন্দী ছিল সুলতান তাদের মুক্তি দিলেন। পার্শী শিল্পী, যার আনা ঘোড়ায় চড়ে রাজকুমার নিখোঁজ হয়েছিল, সেও মুক্তি পেল।

এদিকে কামর-অল-আকমর বাপকে শোভাযাত্রা নিয়ে ঘোড়ায়, মাকে গোরাবাঁদী আর হাবশী বাঁদীদের নিয়ে তাঞ্জামে রওনা করিয়ে দিয়ে নিজে আগে এক ঘোড়ায় চড়ে বাগান বাড়িতে এলো রাজকুমারীকে আগে জানিয়ে দিতে। কিন্তু একি, যে জায়গায় সে রাজকুমারী ও কাঠের ঘোড়াটি রেখে গিয়েছিল সেখানেত সেটা নেই! তবে! বুকটা কেঁপে উঠল তার, তাড়াতাড়ি ছুটলো যেখানে রুপোর পালঙ্কে রাজ- কুমারীকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল। কই রাজকুমারীতো সেখানে নেই। ঘোড়া চালানোর কৌশলটাও তো শিখিয়ে দেয়নি সে। তবে?

কোথায়, কোথায় গেল রাজকুমারী, পাগলের মত একবার এঘর একবার ওঘর এবং বাইরে তাকে খুঁজে বেড়ালো। তারপর ছুটে এলো দরজার খোজা প্রহরীর সামনে। তাকে জিজ্ঞেস করল রাজকুমার, "হ্যারে, এর মাঝে বাইরের কেউ ঢুকে ছিল এ বাগানে? সত্যি কথা বলবি, নইলে এখনই তোকে খুন করে ফেলব।"

প্রহরী উত্তরে বলল, "মিথ্যে কথা কেন বলব হুজুর, ঢুকেছিল ঐ পার্শী কারিগর ঐযে কাঠের ঘোড়া এনেছিল!"

শুনে কামর-অল-আকমরের চোখে অন্ধকার নেমে এল। পৃথিবীতে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে, নিজেকে ঠিক রাখতে খোজার কাঁধে হাত রাখল রাজকুমার।

কয়েক মুহূর্ত পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে যে ঘোড়ায় সে এসেছিল সেই ঘোড়ায় চেপে ছুটল।

বাদশা সাবুরের কাছে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "বাবা, মায়ের দোলা, আপনার শোভাযাত্রা ফিরিয়ে নিয়ে যান, এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

ছেলের ঐ রকম আলুথালু বেশ, উদভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে রাজা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হল বাবা!"

"সেই পার্শী তুশমন রাজকুমারীকে নিয়ে তার জাতু-ঘোড়ায় চড়ে পালিয়েছে।" রাজকুমার শোকে দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল।

"হায় আল্লা!" বলে সুলতান মাথায় হাত দিয়ে ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে যাবার যোগাড়। শোভাযাত্রার লোকজনত থ বনে গেল।

রাজকুমার বলল, "বাবা, আপনারা সব বাড়ি ফিরে যান, আমি আর বাড়ি যাব না। এখন থেকে দেশে দেশে রাজকুমারীকে খুঁজে বেড়াব। যদি খুঁজে পাই তবে দেশে ফিরব—নইলে..."

ছেলের মুখে একথা শোনার পর রাজার চোখে জল এসে গেল। ঘোড়া থেকে নেমে তিনি ছেলের হাত ধরে বললেন, "অত অস্থির হয়োনা বাবা, রাজকুমারীকে আর পাওয়া যাবে না। তুমি ঘরে ফিরে চল বাবা!"

রাজকুমার বলল, "না, রাজকুমারীকে ছাড়া আমি আর অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারব না।" এই কথা বলে রাজকুমার বাবাকে সালাম করে সোজা চলে গেল। রাজপ্রাসাদে নেমে এল বিষাদের ছায়া। ঘন অন্ধকার।
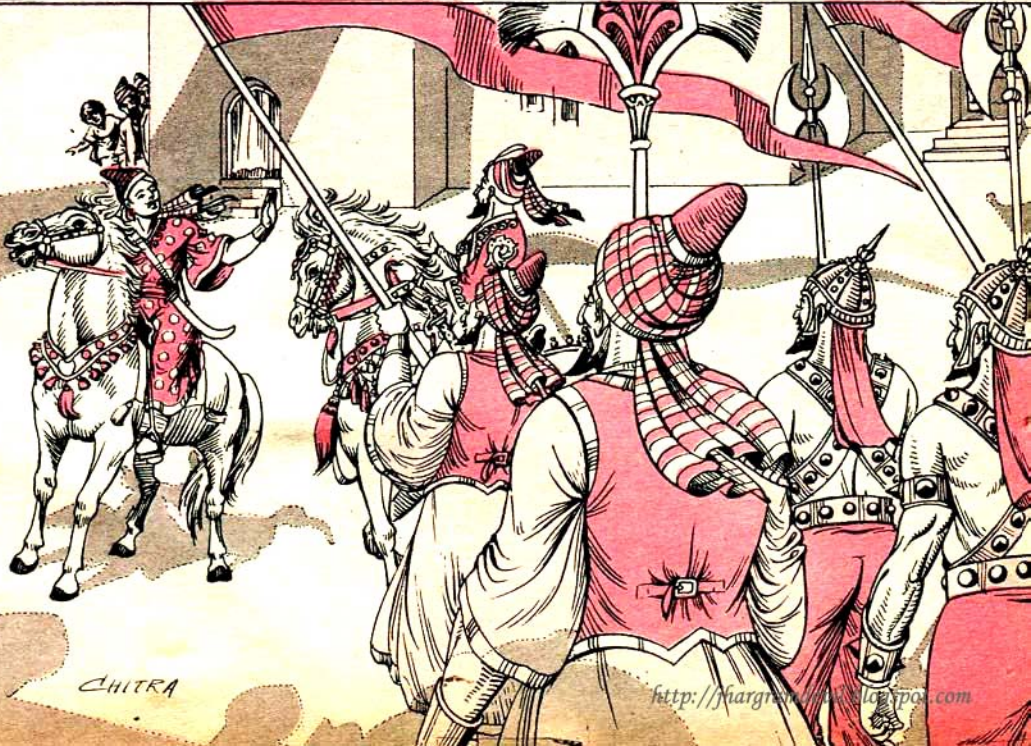
পার্শী পণ্ডিত ভুলতে পারেনি সেদিনের সেই অপমানের কথা।

কারাগারে বসে প্রত্যেক দিন সে শপথ করছিল মুক্তি পেয়ে একদিন না একদিন সে এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

এমন প্রতিশোধ যা বাদশা কোনদিন ভুলতে পারবে না। তাই সেদিন মুক্ত হয়ে রাজকুমার যে কোথায়, কি কি ঘটেছে আর ঘটছে সব কায়দা করে জেনে নিল। জানতে পারল রাজকুমার তার প্রেমিকাকে রেখেছে একটি বাগান বাড়িতে। সেখান থেকে ঘটা করে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে।

পার্শী তখনই ঢুকে পড়ল বাড়িতে কারণ বেশী দেরি করা ঠিক হবে না। এখনই রাজা শোভাযাত্রা নিয়ে কনেকে নিয়ে যাবে। বাড়ি প্রায় নিরালা। শ্বেত পাথরের বারান্দার সামনেই ঘোড়াটা রয়েছে।

প্রথম তার কাছে গিয়ে কলকব্জা গুলো নাড়াচাড়া করে টিপেটুপে দেখল। হ্যাঁ সব ঠিক আছে। এবার আসল জিনিসের খোঁজ করতে হবে। রাজকন্যা কোন্ ঘরে আছে। দক্ষিণ দিকের ঘরটা থেকে কস্তুরী আর গোলাপের সুগন্ধ ভেসে আসছে মনে হচ্ছে! একটু খসখস ঝুনঝুন আওয়াজ!

বারান্দায় উঠে দক্ষিণের ঘরের দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল পার্শী। দেখে, রুপোর ছটায় ঘর আলো করে রুপোর পালঙ্কে বসে আছে অপরূপ এক
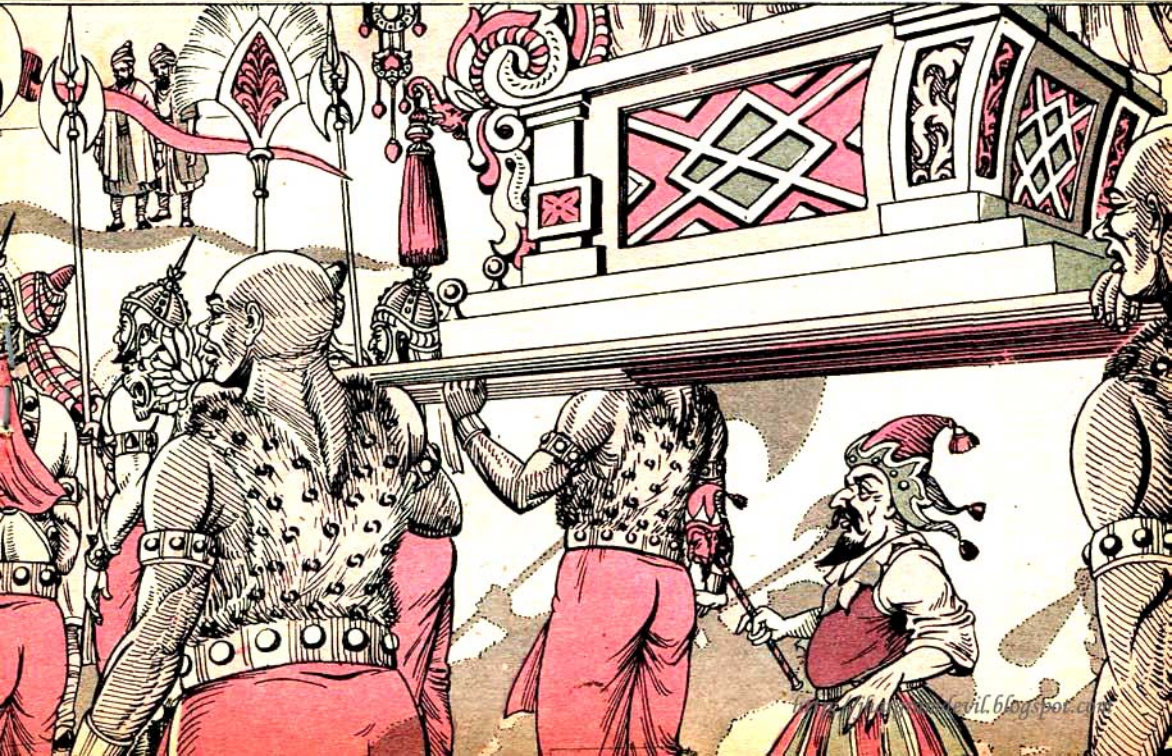
কন্যা। জানালার দিকে মুখ করে বসে ছিল রাজকন্যা।

পার্শী নত হয়ে নমস্কার করে বলল, "রাজা আর রাজকুমার আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন।"

"কে? কে তুমি?" রাজকন্যা জিজ্ঞেস করল।

"আমি রাজার অনুচর। একমাত্র আমারই উপর হুকুম হয়েছে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার?"

"কিন্তু রাজকুমার যে বলে গেলেন রাজা স্বয়ং শোভাযাত্রা করে নিতে আসবেন!" রাজকুমারী সন্দেহ মিশ্রিত কণ্ঠে বলল।

"হ্যাঁ শোভাযাত্রাই আসছে, কিন্তু এত দূরে আসতে পারবেন না। সবাই পায়ে হেঁটে আসছেন কিনা, রানীর পায়ে ব্যথা। বাদশার মহলের কাছেই একটা বাগান বাড়ি আছে, সেখানে নিয়ে যেতে হবে আপনাকে।" বলল পার্শী কারিগর।

"কি করে নিয়ে যাবে?" প্রশ্ন করল রাজকুমারী।

"ঐ ঘোড়ায় করে।" পার্শী বলল।

"ঘোড়াত চালাতে জানি নে আমি।" রাজকন্যা বলল।

"আপনি জানেন না, আমি জানি।" বলল পার্শী শিল্পী।

"তুমি জানো?" রাজকুমারী প্রশ্ন করল।

"আজ্ঞে।" পার্শী কারিগর জবাবে বলল।

সরল বিশ্বাসে পালঙ্ক থেকে নেমে এল রাজকুমারী। পার্শী বেশ সমীহ করে তার হাত ধরে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিজের পিছনে বসালো। আর নিজে সামনে সোজা হয়ে বসল। তার পর নিজের পাগড়ি খুলে আচ্ছা করে বেঁধে দিল রাজকন্যাকে নিজের দেহের সঙ্গে। তার পর পার্শী ঘোড়ার ডান দিকের বোতামটা দিল টিপে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া তীরের বেগে আকাশে উঠে গেল।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

বীর বাম্বি

সিংগিবনের নেতাকে হত্যা করল ছোট ভাই চেঙ্গি। সেই নেতার ছেলে বাম্বি ছিল খুব ছোট! বাম্বির মা সেই রাত্রে চেঙ্গি ও তার লোকজনের চোখে ধুলো দিয়ে বনের অন্য প্রান্ত থেকে পালাল এক শহরে। সেখানকার এক মিশনারীর ফাদার বাম্বিকে আর তার মাকে আশ্রয় দিলেন। দেখাশোনার ভার নিলেন। দিনে দিনে বাড়ে বাম্বি। তার শরীরে অসীম শক্তি। তার বয়স যখন আঠার বছর তখন তার মা সাপের ছোবল খেয়ে মারা গেল।

"বাবা, তুমি রাজার ছেলে। সিংগিবনের রাজা হওয়ার অধিকার তোমারই ছিল। তোমার কাকা চেঙ্গি তোমার বাবাকে হত্যা করে সিংগিবনের নেতা হয়ে আছে। তুমি যে রাজপুত্র তার প্রমাণ···" বলতে বলতে বাম্বির মা মারা গেল।

ছেলের বা নিজের পরিচয় মিশনারির ফাদারের কাছে মরার আগেও জানাতে সাহস করল না বাম্বির মা। কারণ চেঙ্গির লোকজন ঐ শহরেও ঘুরে বেড়াত। জানা-জানি হলে বাম্বির জীবন বিপন্ন হত।

একথা শুনে মার মৃতদেহ ছুঁয়ে শপথ করল এক পক্ষকালের মধ্যে সে বদলা নেবে।

বাম্বি পরের দিনই বেরিয়ে পড়ল। শিকারীদের পিছনে পিছনে গিয়ে সে সন্ধ্যা নাগাদ সিংগিবনে পৌঁছে গেল। সেরাত্রে সে এক গাছের উপর কাটাল। সকালে এক বিচিত্র ধরণের লোক জিরাফের মত একটা জন্তুতে চড়ে সামনে এল। তার মাথায় ছিল দুটো সিং আর বাজ পাখির

এ. সি. সরকার (জাদুকর)
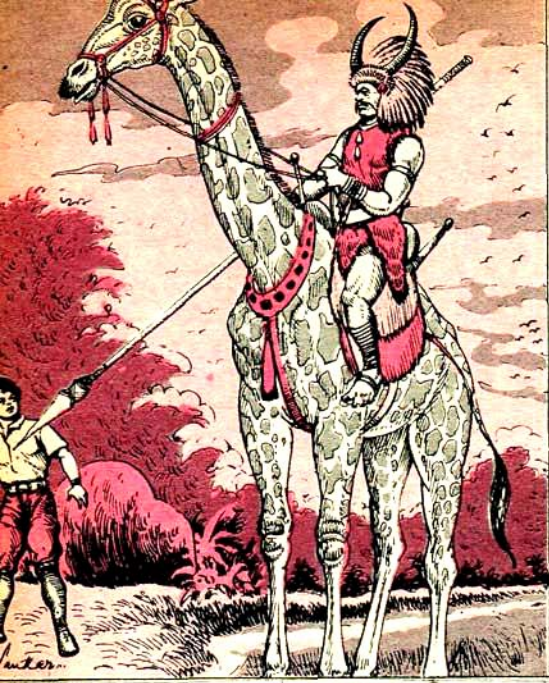
পালক লাগানো মুকুট। হাতে ছিল এক বল্লম। গায়ে ছিল সিংহের চামড়া।

লোকটা বাম্বির দিকে বল্লম ধরে জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি ?"

"আমি গোরা সাহেবের শিকারীদলের একজন। পথ ভুলে এসে গেছি।" একথা বলে বাম্বি পকেট থেকে সিগারেট ধরানোর লাইটার বের করে বলল, "এটা আগুন ধরানোর যন্ত্র।" সে লাইটারের আগুন ধরিয়ে দেখাল। লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

"এটা তোমার চাই ?" বাম্বি জিজ্ঞেস করল। ঐ বুনো লোকট্টা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

"ঠিক আছে নাও। একটা কথা বলব ?" বাম্বি বলল।

"কি ?" বুনো লোকটা জিজ্ঞেস করল।

আমাকে তোমার বাড়িতে থাকতে দেবে ? বাম্বির প্রশ্ন।

"আমাদের চেঙ্গি বড় মারাত্মক লোক। আমাদের দেশে অন্য দেশের লোক থাকতে পারে না।" বুনো লোকটা বলল।

"আমাকে বন্ধু বানিয়ে তো রাখতে পার। নাকি সেটুকু উপকার করার মত ক্ষমতাও তোমার নেই! ভাল কথা, অন্য দেশের লোককে তোমার নেতা থাকতে দেয় না কেন বলত ? বাম্বি প্রশ্ন করল।

"চেঙ্গি যে বাম্বিকে ভীষণ ভয় পায়। বাম্বিকে চেন না তো ? বাম্বি হল আমাদের মৃত নেতার একমাত্র ছেলে। আমাদের সেই নেতা যে কী ভাল লোক ছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। নিষ্ঠুর চেঙ্গি তাকে বধ করেছে। আমাকে খুব ভাল বাসত। আমি ঐ নেতার নিজস্ব লোক। চেঙ্গি আমাকে ভীষণ সন্দেহ করে।" বুনো লোকটা বলল।

তোমাদের চেঙ্গির ভয় কিসের ? সে কি মনে করে যে বাম্বি বেঁচে আছে ? বাম্বি যে কোন দিন এসে তার পদ দাবি করবে ?" বাম্বি জিজ্ঞেস করল।

"চেঙ্গির কয়েকজন অনুচরের ধারণা যে বাম্বি এখনও বেঁচে আছে। আমার

বাবার উপর অপরাধ চাপানো হয়েছিল। বাবা নাকি বাম্বি আর তার মাকে বনের সীমানা গোপনে পার করে দিয়েছিল। এই অপরাধে বাবাকে চেঙ্গি জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে।" বুনো লোকটা বলল।

"আচ্ছ তোমার নাম কি বলত?" বাম্বির প্রশ্ন।

"নাম সিংহ দমন ডিঙ্গু।" লোকটা বলল।

"আচ্ছা ডিঙ্গু, বাম্বি ফিরে এলে কি তুমি খুব খুশী হবে?" বাম্বি জিজ্ঞেস করল।

"আমি খুশী হব না কেন? চেঙ্গি আমার বাবাকে পুড়িয়ে মেরেছে। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি আমার বাবাকে মেরে ফেলার বদলা নেবই। আমার দেশের লোকও খুব খুশী হবে। তবে আমার দেশের লোক সব তান্ত্রিকের কথা খুব বিশ্বাস করে। তান্ত্রিকটা আবার চেঙ্গির খয়ের খাঁ। তান্ত্রিক বলে বেড়াচ্ছে যে সে মন্ত্র তন্ত্রের বলে বাম্বিকে মেরে ফেলেছে। বাম্বির ফিরে আসার আর কোন আশঙ্কা নাকি নেই। বাম্বি আসলে ভূত হয়েই আসতে পারে। ভূত হয়ে আসলে আমার দেশের ফসল নাকি নষ্ট হয়ে যাবে, সবাই মরে যাবে।" ডিঙ্গু বলল।

"ঐ তান্ত্রিকের কথা তোমরা বিশ্বাস কর? পাজী চেঙ্গির হাত থেকে তোমাদের মুক্ত করার যদি চেষ্টা করি তোমরা কি আমাকে সাহায্য করবে?" বাম্বি জিজ্ঞেস করল।
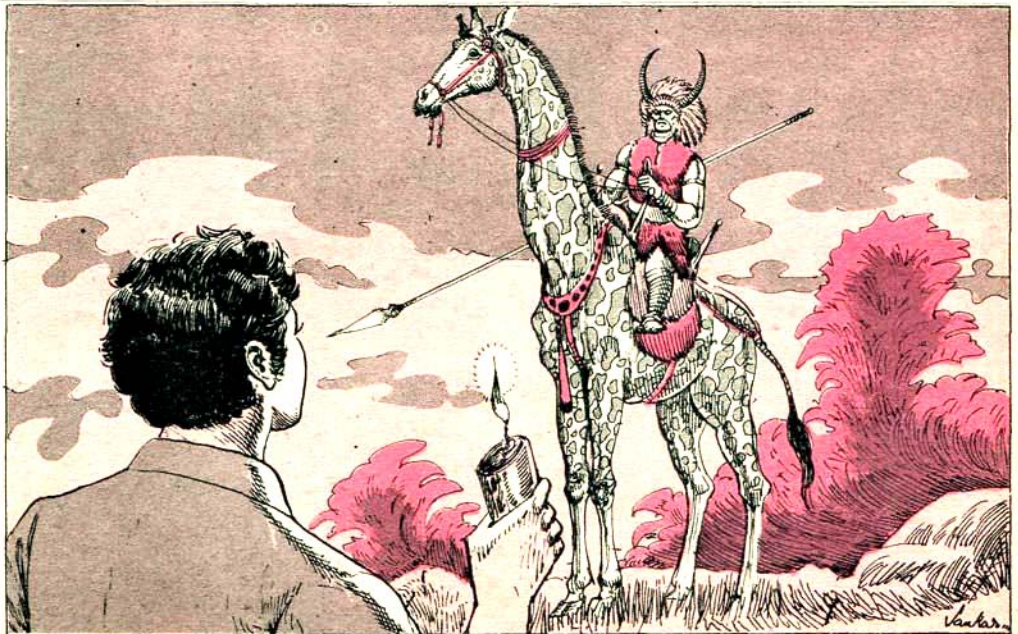
"আমি দরকার হলে জান দেব।" ডিঙ্গু দৃঢ়তার সাথে বলল।

"বেশ, এখন থেকে আমি তৈরি হচ্ছি। আমি বাম্বির বন্ধু। বাম্বি বেঁচে আছে। সে ফিরতে চায়।" বাম্বি বলল।

ডিঙ্গু এক লাফে জিরাফের পিঠ থেকে নিচে নাবল। নিজের গায়ে যে ধরণের পোশাক ছিল সেই রকমের পোশাক বাম্বিকে পরিয়ে সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করল।

অন্ধকার হয়ে গেলে ডিঙ্গু বাম্বিকে নিজের কুঠিরে নিয়ে গেল। বাম্বি ঠিক করে নিল কি করবে। ফাদারের কাছে বাম্বি মন্ত্রতন্ত্র শিখে নিয়েছিল। একটি মন্ত্র প্রয়োগ করলেই কাজ হয়ে যাবে।

"আচ্ছা তান্ত্রিকদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে বাম্বি এলে খুশী হবে?"

"চেঙ্গির ডান হাত ঐ বোঙ্গেচু বাদে সবাই বাম্বি আসছে শুনে খুশী হবে। আমাদের পুরোনো নেতার তান্ত্রিক সিঞ্চুর কথা লোকে খুব বিশ্বাস করে।" ডিঙ্গু বলল।

"তাহলে তুমি এক কাজ কর। পেঁয়াজ কেটে তার রস দিয়ে এই কাগজে লেখ : "বাম্বি বেঁচে আছে! তাকে নেতা কর! এটা গোড়ুডু দেবতার নির্দেশ!" ঘাসের টুকরো দিয়ে লিখে তা শুকিয়ে নাও। আর সেই কাগজের টুকরোটা সিঞ্চুকে দিয়ে দাও। সিঞ্চুকে বল সে যেন লোককে বলে যে সে একটা স্বপ্ন দেখেছে। সে দেখেছে গোড়ুডু দেবতা তাকে বলেছে যে নীল পাহাড়ের চূড়ায় পাথরের আধারে রাখা আছে একটা কাগজ। সেই কাগজ আগুনে গরম করে নিলে তাতে ফুটে উঠবে দেবতার বাণী। তবে এই কথা প্রচার করার আগে সিঞ্চু যেন ঐ কাগজ নীল পাহাড়ের এক জায়গায় রেখে আসে। তারপর কি করতে হবে তা আমি সিঞ্চুকে সাক্ষাতে বলব। তুমি পরে সিঞ্চুর সাথে আমার দেখা করিয়ে দেবে।" বাম্বি বলল।

বাম্বির পরিকল্পনা মত কাজ হতে লাগল।

সিঞ্চু কয়েকজন তান্ত্রিককে সঙ্গে নিয়ে নীল পাহাড়ে গেল। ওরা সবাই সিঞ্চুর

কথা মত নীল পাহাড়ে পেল একটি কাগজ। তারপর সবাই গোড়ুডু দেবতার মন্দিরের সামনে এল। নেতাও হাজির হল সেখানে। সবাই পরীক্ষা করতে লাগল কাগজটাকে। সাদা কাগজ। সিঞ্চু আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পাঠ করতে লাগল। তার পর সেই কাগজ আগুনে ধরা হল। আগুনের উত্তাপে কাগজের বুকে গমের রঙের লেখাগুলো ফুটে উঠল। "বাম্বি বেঁচে আছে! তাকে তোমাদের নেতা কর! এটা গোড়ুডু দেবতার নির্দেশ!"

এই সব কথাগুলো পড়ার পর চেঙ্গি অশ্বস্তি ও বিরক্তি বোধ করতে লাগল। তার অনুচররাই বল্লম নিয়ে তাকে এবং তার ডান হাত বোঙ্গেচু তান্ত্রিককে ঘিরে ফেলল।

"কিন্তু বাম্বি কোথায়? আমি তাকে আমার মন্ত্র বলে অনেক আগেই মেরে ফেলেছি।" বোঙ্গেচু চিৎকার করে উঠল।

"আমি মরিনি! বেঁচে আছি। এখানেই আছি।" বলে ভীড় ঠেলতে ঠেলতে বাম্বি এগিয়ে এল।

"একে বন্দী কর! এ বাম্বি নয়! এ ধোকা দিতে এসেছে!" চেঙ্গি গর্জে উঠল।

কিন্তু সিঞ্চু শান্ত কণ্ঠে বলল, "এ যদি সত্যি সত্যি বাম্বি হয় তাহলে এর পেটের বাঁ দিকে একটি মোহরের ছাপ থাকবে। আমি এর জন্মাবার পর একটি মোহরের ছ্যাঁকা লাগিয়ে ছিলাম। বাঁ হাত তুললেই ঐ চিহ্ন নজরে পড়বে।"

বাম্বি বাঁ হাত তুলতেই সবাই দেখতে পেল সেখানে ঐ মোহরের ছাপ। তৎক্ষণাৎ সবাই আনন্দে হর্ষনাদ করে উঠল।

চেঙ্গি ও বোঙ্গেচু পালানোর তাল করতেই লোকে তাদের বেঁধে ফেলল।

"এই দুজনকে আমাদের দেশের ত্রি-সীমানার বাইরে চিরকালের মত রেখে এস।" বাম্বি নির্দেশ দিল।

প্রত্যুপকার

শিবরামের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তার মেয়ের বিয়ে দেবার বয়স হল। কিন্তু মেয়ের বিয়ে দিতে কম করে এক হাজার টাকা চাই। শিবরামের কাছে অত টাকা ছিল না। তার চাকরি ছিল নন্দলালের কাছারিতে খাতা লেখা।

শিবরামের বাবা ধনী ছিল। ধনী হিসেবে তার খুব নাম ডাক ছিল। লোকটা দানধর্ম করতে খুব ভালবাসত। সাহায্য চাইতে যে আসত তাকে খালি হাতে ফেরাত না। এই সাহায্য করতে গিয়েই নিজে ফতুর হয়ে গেল। এমন কি যে নন্দলালের কাছে শিব-রাম চাকরি করত সেও একদিন শিবরামের বাবার টাকা দিয়েই ব্যবসা শুরু করেছিল।

শিবরাম মেয়ের জন্য পাশের গ্রামের একটা পাত্র ঠিক করল। পাত্র ভালই। তবে গুণে এক হাজার টাকা পণ দিতে হবে। শিবরাম ভাবল তার বাবা এত লোককে সাহায্য করেছে। সবার কাছে কিছু কিছু জোগাড় করলে ঠিক জুটে যাবে টাকা। এই আশায় সে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে পাকা ব্যবস্থা করে ফেলল। কিন্তু শিবরামের আশা পূরণ করতে, তাকে কিছু দান করাতো দূরের কথা ধার দিতেও কেউ এগিয়ে এলো না। শেষে শিবরাম তার মালিকের কাছে টাকা ধার চাইল। কিন্তু নন্দলাল যেন আকাশ থেকে পড়ল। অগত্যা শিবরাম ঠিক করল পাত্রপক্ষকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে আসবে।

শিবরাম মনে মনে যা ঠিক করল তা অন্য কাউকে জানাল না। একদিন ভোর

রিন্টু মুখোপাধ্যায়

রাত্রে বেরিয়ে পড়ল। সেদিন ছিল অমাবশ্যার রাত্রি। ঘন অন্ধকার। পথে পা দিয়েই শুনতে পেল শেয়ালের ডাক। পেঁচার ক্রমাগত আর্তনাদ যেন অন্ধকারকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলল। শেয়াল পেঁচা আর ঝিঁঝিঁর ডাকে রীতিমত ভয় পেল শিবরাম। মাথার উপর দিয়ে চামচিকে আর পেঁচা ঘন ঘন উড়ে যাচ্ছিল। শেয়াল-গুলো যেন তাকে ভয় পাচ্ছে না। কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছিল। অবস্থা দেখে শুনে শিবরামের মনে হল সকাল হতে অনেক দেরি। শিবরাম ভয়ে ঘেমে উঠল। ঠিক তখনই সে দেখতে পেল তার সামনে কে যেন হাঁটছে। লোকটার হাতে ছিল একটা থলি। লোকটাকে দেখেই শিবরামের ধড়ে যেন প্রাণ এল। শিবরাম হাততালি বাজিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, "সামনে কে যায় ?"

সামনে যে লোকটা হাঁটছিল সে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। শিবরাম কাছে গেলে সে বলল, "আমাকে সবাই মাষ্টার মশাই বলেই ডাকে। পাশের গ্রামে যাচ্ছি। আপনি কে ? কি নাম আপনার ?"

"আমার নাম শিবরাম। পাশের গ্রামে আমিও যাচ্ছি।" শিবরাম বলল।

"পাশের গ্রামে আপনি কি করেন ? কোন বাড়িটা আপনার ?" শিবরামের প্রশ্ন।

"আজকাল আমি আর কোন কাজ করছি না। গ্রামের মাঝে অশ্বত্থ গাছের গায়ে আমার বাড়ি।" মাষ্টার মশাই বলল।

শিবরাম নিজের সমস্ত কথা বিস্তারিত ভাবে জানিয়ে বলল, "আমার বাবা বহু লোককে সাহায্য করে একেবারে পথে বসে গেছেন। যাঁদের সাহায্য করেছিলেন তাঁদের একজনও আমার বিপদে দাঁড়াল না।"

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মানুষের মহৎ গুণ। আপনার গ্রামে শম্ভুবাবু নামে একজন ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে আমি যে সাহায্য পেয়েছি তা কোনদিন ভুলব না। তিনি মানুষ নন, দেবতা ছিলেন।" মাষ্টার মশাই বলল।

শিবরাম বলতে যাচ্ছিল যে শম্ভুবাবু তারই বাপের নাম। কিন্তু তার আগেই শিবরামের হাতে একটা থলে দিয়ে মাষ্টার মশাই বলল, "এটা একটু ধরুন তো। আমি একটু আসছি।" বলে মাষ্টার মশাই বনের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও মাষ্টার মশাই যখন ফিরল না তখন সে আস্তে আস্তে নিজের পথে এগোতে লাগল।

সকাল হয়ে এল। গ্রামে ঢুকে একটু খুঁজে পেল সেই অশ্বত্থ গাছের পাশের বাড়িটি। দাওয়ায় বসে ছিল এক বুড়ি।

"দিদিমা, এটাই তো মাষ্টার মশাইয়ের বাড়ি? উনি একটা কাজ সেরে আসছেন। আমাকে এক্ষুণি ফিরে যেত হবে। এই থলিটা উনি আমাকে ধরতে দিয়েছেন। আমি অপেক্ষা করতে পারব না। থলিটা আমি আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি।" শিবরাম বলল।

"কোন্ মাষ্টার মশাই? পঁচিশ বছর আগে যিনি মারা গেছেন? আমার শ্বশুর মশাইয়ের কথা বলছ?" বুড়ি বলল।

শিবরাম অবাক হয়ে গেল। তাহলে কি এতক্ষণ সে ভূতের সঙ্গে কথা বলল! তারপর সে মাষ্টার মশাইয়ের দেয়া থলি খুলে দেখতে পেল তিন হাজার টাকা!

"দিদিমা, এই টাকা নিন।" শিবরাম বলল।

"না ভাই, উনি নিশ্চই কোন কাজে ঐ টাকা তোমাকে দিয়েছেন।" বুড়ি বলল।

শিবরামের মনে পড়ল মাষ্টার মশাইয়ের কথা। এক সময় বাবার কাছে সে উপকৃত হয়েছিল। ভাবল এ বুঝি তার প্রত্যুপকার। এই সব ভেবে শিবরাম বুড়িকে বলল, "এত টাকা আমার দরকার নেই। এর অর্দ্ধেক আপনি নিন।" বলে বুড়ির হাতে অর্দ্ধেক টাকা দিয়ে বাকি অর্দ্ধেক নিজে রাখল। তার মেয়ের বিয়েও নির্বিঘ্নে হয়ে গেল।

অবিশ্বাস

প্রাচীন কালের কথা। এক নগরে রামলাল নামে এক হীরার ব্যবসাদার ছিল। সে গোবিন্দ নামে এক বলিষ্ঠ পালোয়ানকে চাকর রাখল। রামলাল বিশ্বাস করত না গোবিন্দকে। কেউ হীরা পান্না অথবা চুনি কিনতে এলে রামলাল কোন না কোন অজুহাতে তাকে অন্য কোন কাজে পাঠিয়ে দিত। তার ভয় গোবিন্দ যদি দেখে ফেলে হীরা রাখার জায়গা !

কিছুকাল পরে গোবিন্দ বুঝতে পারল যে তার কর্তা তাকে বিশ্বাস করছে না। গোবিন্দ ঠিক করল সুযোগ বুঝে রামলালের ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেবে।

একদিন রামলাল খেতে গেলে দোকানে দুজন ঢুকে গোবিন্দকে দেখে থমকে গেল।

তখন গোবিন্দ তাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন ? আসুন, বসুন।"

ওদের দুজনের একজন গোবিন্দর কাছে গিয়ে বলল, "মালিক কোথায় ?"

"ভিতরে আছেন। খেতে বসেছেন।" গোবিন্দ জবাবে বলল।

সেই লোকটা গোবিন্দকে বলল, "মালি-কের কাছে কত টাকার হীরা মণি মুক্তো আছে ? ওসব কোথায় রাখা আছে ? আমাদের সাহায্য করলে অর্দ্ধেক ভাগ তোমাকে দেব।"

গোবিন্দ ওদের দুজনকে ভাল করে দেখে বলল, "একটু দাঁড়ান। আমি ভিতরে গিয়ে সব জেনে এসে বলছি।" এ কথা বলে গোবিন্দ ঘরের ভিতরে গিয়ে বলল, "কর্তা, হীরে কিনতে অনেক দূর থেকে

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

খুব ধনী লোক এসেছে। মনে হচ্ছে টাকা পয়সাওলা লোক।”

রামলাল একথা শুনে তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গুঁজে উঠে ওদের কাছে গিয়ে গোবিন্দকে বলল, “গোবিন্দ খদ্দেরদের ভাল ভাবে বসিয়ে তুমি পুকুরে কত গভীর জল আছে মেপে এসো তো। যাও।”

“যাচ্ছি।” বলে গোবিন্দ চলে গেল।

সুযোগ পেয়ে ভদ্রলোক-মুখোসধারী চোরগুলো সোজা ঘরে ঢুকে পড়ল। রামলালের হাত পা বেঁধে ফেলল। সিন্দুক খুলে হীরা মণি মুক্তো বের করে থলিতে ভরল। রামলাল “গোবিন্দ গোবিন্দ” বলে চিৎকার করল। ওরা সঙ্গে সঙ্গে কাপড় পুরে দিল তার মুখে। ওদিকে গোবিন্দ বেশি দূর যায় নি। ও চোরদের বেরুনোর মুখে তকে তকে ছিল। ওদের বেরুনোর সাথে সাথে জিজ্ঞেস করল, “আপনাদের কাজ হয়ে গেছে?”

“হ্যাঁ, হয়ে গেছে। এই নাও তোমার ভাগ!” চোরগুলো বলল।

“তোমরা ভেবেছ আমি চুরির ভাগী হতে এখানে দাঁড়িয়ে আছি!” হঠাৎ গোবিন্দ হুঙ্কার ছেড়ে চোরদের মারতে আরম্ভ করে দিল। ওদের হাত থেকে হীরা মণি মুক্তার থলি কেড়ে নিল। গোবিন্দকে দেখে রামলাল হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগল। রামলাল কাঁদতে কাঁদতে বলল, “গোবিন্দ! আমার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে গেছে! সর্বনাশ হয়ে গেছে গোবিন্দ!”

“আমি চোরদের উচিত শিক্ষা দিয়েছি। থলিগুলো ভাল ভাবে দেখে নিন সব জিনিস ঠিক আছে কিনা।” বলে গোবিন্দ তার সামনে থলিগুলো রেখে তার বাঁধন খুলল। রামলাল হাঁকপাঁক করে সব দেখে ভীষণ খুশী হয়ে বলল, “ওরে গোবিন্দ, আমি জানতাম না যে তুমি এত বিশ্বাসী। এতদিন তোমাকে ভুল বুঝেছি। সত্যি তুমি কত সৎ।”

চতুর চিত্রশিল্পী

অনেককাল পূর্বে ভারতের মধ্য অঞ্চল থেকে এক প্রতিভাশালী চিত্রশিল্পী যবন দেশে গিয়েছিল। সেখানে এক দক্ষ যন্ত্রাচার্য ছিল। সে চিত্রশিল্পীকে নিজের বাড়িতে থাকার ও খাওয়ার নিমন্ত্রণ করল। অতিথির দেখাশোনার কাজ সে এক যন্ত্র-নারীকে দিয়ে করিয়ে নিল। সেই যন্ত্রনারী ঐ যন্ত্রাচার্যের হাতে তৈরী।

সেই যন্ত্রনারী চিত্রশিল্পীর পা ধুয়ে যখন ফিরছিল তখন তার দিকে তাকিয়ে চিত্র-শিল্পী তাকে জীবন্ত নারী ভাবল। সে ঐ নারীকে কয়েকটি প্রশ্ন করল। কিন্তু নারীর মুখ থেকে একটি কথাও বেরুলো না।

তখন চিত্রশিল্পী হঠাৎ তার হাত ধরে টান দিল। সেই টানের চোটে যন্ত্রনারীর ভিতরের যন্ত্রপাতিগুলো খুলে গেল। মুহূর্তে চিত্রশিল্পী বুঝতে পারল যে ঐ নারী যন্ত্র দিয়ে তৈরী। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রা-চার্যের দক্ষতায় মুগ্ধ হল। কিন্তু ঐ যন্ত্রনারীর ব্যাপারে যন্ত্রাচার্য চিত্রশিল্পীকে কোন কথাই বলল না। এই না বলাতেই চিত্রশিল্পী অপমান বোধ করল। চিত্রশিল্পী ঠিক করল এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতিভারও পরিচয় দেবে।

তার পরই চিত্রশিল্পী এমন একটি ছবি আঁকল সেই ছবিতে আছে ঐ চিত্রশিল্পী গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। ছবিটি ঘরে ঝুলিয়ে রেখে চিত্রশিল্পী নিজে ঘরের এক কোনে কাঠের স্তুপের আড়ালে লুকাল।

তারপর এক সময় যন্ত্রাচার্য ঘরের কাছে এসে দেখল চিত্রশিল্পী গলায় দড়ি দিয়ে

অনুরাধা দেবী

ঝুলছে ! সর্বনাশ ! দেখল দরজা খোলা ! নিচে দেখতে পেল যন্ত্রনারী ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। আর স্বয়ং চিত্রশিল্পী গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে !

এই দৃশ্য দেখে যন্ত্রাচার্য ভীষণ ভয় পেল। যন্ত্রনারী আর একটা বানিয়ে নেওয়া যাবে কিন্তু এই চিত্রশিল্পীর আত্ম-হত্যার ব্যাপারটা কি হবে ! ভারতের একজন শিল্পীর আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু রটবে। দুর্নাম হবে তার। সে ঠিক করল সরকারী অধিকারীদের দিয়ে এই ঘটনার তদন্ত করাবে।

এ কথা ভেবে যন্ত্রাচার্য নিজের দেশের রাজার কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা জানাল। রাজারও আসল ঘটনা জানার আগ্রহ জাগল। রাজা ঐ ব্যাপারটার তদন্ত করার ভার দিয়ে দরবারের কয়েকজন পাহারা-দারকে যন্ত্রাচার্যের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। পাহারাদাররা চিত্রশিল্পীর ঘরে উঁকি মেরে দেখল। দেখতে পেল চিত্রশিল্পীর মৃতদেহ ঝুলছে। ওরা ভাবতে লাগল কি ভাবে শব নাবানো যায়। কয়েকজন তররারি, বল্লম ও ছুরি বের করল। চিত্র-শিল্পীর গলার দড়ি কাটতে গেল।

ঠিক তখনই আড়াল থেকে চিত্রশিল্পী তাদের সামনে হাজির হল। তাকে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল।

চিত্রশিল্পী যন্ত্রাচার্যকে বলল, "মশাই আপনি যন্ত্রনারী বানিয়ে আমার সেবার কাজে লাগিয়ে ছিলেন। বেশ মজার কাণ্ড করে ছিলেন। তাতে আপনার দক্ষতার পরিচয় পেয়েছিলাম। আমি একা বোকা বনে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি যা করেছি তাতে আপনি বোকা বনলেন, আপনার দেশের রাজার পাঠানো লোক-গুলোও ধরতে পারল না।

এ কথা শুনে যন্ত্রাচার্য লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলল।
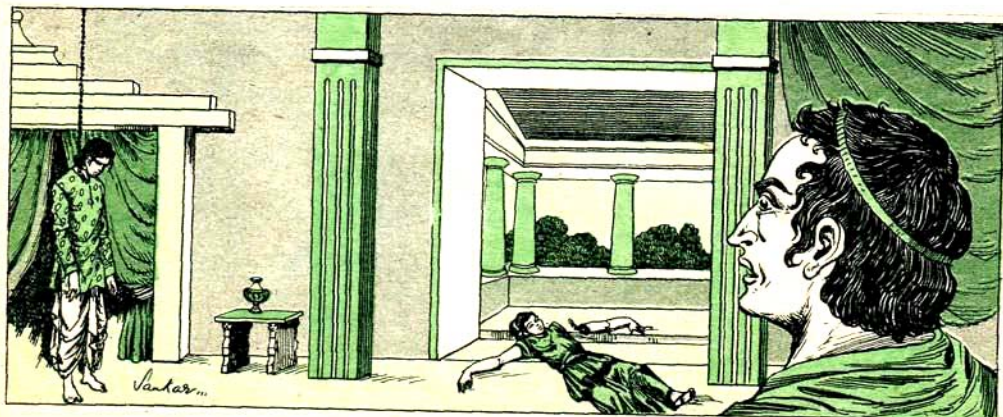
পরোপকার

অরুণপুরে বীরমল্ল নামে এক চোর ছিল। সে সিঁধ কেটে আর পথিকদের পয়সা-কড়ি জিনিসপত্র লুঠ করে দিন কাটাত। কোন পুণ্য কাজ জীবনে সে করেনি।

একদিন একজনের ঘরে সিঁধ কাটছিল। কাটার সময় তার মনে হল বাড়ির কর্তা জেগে আছে। দুজনের কথা শুনতে পেল। বীরমল্ল কান খাড়া করে ওদের কথা শুনল। এক যুবক তার মাকে বলছে, "মা কাল সকালে আমাকে পাশের গ্রামে যেতে হবে। আমাকে দুটো পোঁটলায় ভাত বেঁধে দেবে। একটা আমার জন্য আর একটা মাটির জন্য।"

মা বলল, "তাই দেব বাবা!" তারপর মা ও ছেলে দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল।

এই কথা শোনার পর বীরমল্ল সিঁধ কাটা যেন ভুলে গেল তখনকার মত। বার বার ঐ যুবকের কথা ভাবতে লাগল। সে সকাল পর্যন্ত ঐ খানেই ঘোরাঘুরি করতে লাগল। যে কোন ভাবে ঐ কথার অর্থ জানার প্রচণ্ড আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।

সকালে ছেলে বেরুতে গেল। মা তার হাতে দুটো পোঁটলা বেঁধে দিল।

মার হাত থেকে দুটো পোঁটলা নিয়ে যুবক বেরিয়ে পড়ল। চোরও তাকে দূর থেকে অনুসরণ করতে লাগল। চলতে চলতে দুপুর হয়ে গেল। যুবক এক গাছের নিচে খেতে বসল। বীরমল্লও ঐ গাছের নিচে পৌঁছাল।

যুবক বীরমল্লকে দেখল। দুটো পোঁটলা খুলে একটা বীরমল্লের সামনে রাখল আর অন্যটা নিজের সামনে।

যুবকের এই ব্যবহার দেখে বীরমল্ল অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। একটা অচেনা

রতন বোস

লোককে যে কেউ ক্ষেতে দেয় তা বীর-মল্লের কাছে রীতিমত অবাক হওয়ার ঘটনা। সে তো সিঁধ কাটে আর লুঠ করে। এর বাইরে এ-রকম একটা জীবন যে আছে তা সে জানত না।

বীরমল্ল যুবককে জিজ্ঞেস করল, "দাদা, আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। আপনি জবাব দেবেন ? না দিলে কিন্তু আপনার এই খাবার খাব না।"

"কি প্রশ্ন করতে চান।" যুবক বলল।

"আমার পেশা চুরি করা। কাল রাত্রে আমি আপনার বাড়িতে সিঁধ কাটতে গিয়েছিলাম। সিঁধ কাটা বন্ধ রেখে আড়ি পেতে শুনলাম আপনার কথা। আপনি মাকে যা বললেন তা শুনে মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। এই জন্যই আমি আপনার পিছনে পিছনে এতদূর এসেছি। এখনও আমি বুঝতে পারিনি।" চোর বলল।

যুবক হেসে বলল, "দেখ ভাই আমি তোমাকে যা খেতে দিলাম তা আমার ভাগের, নিজে নিয়েছি মাটির ভাগের।"

"কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি যা খাচ্ছি তা যদি আপনার ভাগের হয় তো আপনি খাচ্ছেন কার ভাগের ?" বীরমল্ল বলল।

আমি যা খাই তা হজম হয়ে মাটিতে যায়। অন্যকে যা খেতে দিয়ে থাকি তা পুণ্য কাজ হিসেবে ধরা হয়। তুমি চুরি করে যা পাও তা খরচ হয়ে যায়। অন্যের উপকার কর না। পরোপকার ছাড়া পুণ্য হয় না।" যুবক বলল।

এই কথা শুনে চোরের যেন চোখ ফুটল। সেই দিন থেকেই সে চুরি ও লুঠ করা ছেড়ে দিয়ে পরিশ্রম করে রোজগার করত আর তার রোজগারের কিছুটা খরচ করত পরের জন্য। চোর তার বাকি জীবনটা এই ভাবেই কাটাল।

মহাভারত

মহর্ষি কণ্ব বললেন, "দুর্যোধন, মনে করো না তুমিই একমাত্র বলবান, বলবান অপেক্ষাও বলবান আছে। একটি পুরানো কাহিনী বলছি শোন।" —ইন্দ্রের সারথি মাতলির একটি পরম রূপবতী কন্যা ছিল। তার নাম ছিল গুণকেশী। মাতলি কন্যার উপযুক্ত বর কোথাও না পেয়ে পাতালে গেলেন। সেই সময়ে নারদও যাচ্ছিলেন বরুণের কাছে। তিনি বললেন, আমরা তোমার কন্যার জন্য বর ঠিক করে দেব।

নারদ মাতলিকে নাগলোকে নিয়ে গেলেন এবং নানা রকম আশ্চর্য জিনিস দেখালেন।

মাতলি বললেন, "এখানে আমার কন্যার যোগ্য বর নেই অন্যত্র চলুন।"

তারপর সেখান থেকে তাঁরা অনন্ত নাগ বাসুকির পুরীতে গেলেন। সেখানে একটি নাগকে বহুক্ষণ দেখে মাতলি নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই সুদর্শন নাগ কার বংশধর ? একেই আমি গুণকেশীর যোগ্য বর বলে মনে করি।

নারদ বললেন, "ইনি ঐরাবত নাগের বংশজাত আর্যকের পৌত্র, এঁর নাম সুমুখ। কিছুকাল আগে এঁর পিতা চিকুর গরুড় দ্বারা নিহত হন।"

মাতলি প্রীত হয়ে বললেন, "এই সুমুখই আমার জামাতা হবেন।"

নারদ সুমুখের পিতামহ আর্যকের কাছে গিয়ে মাতলির ইচ্ছা জানালেন।

আর্যক বললেন, "দেবর্ষি, ইন্দ্রের সখা মাতলির সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ কে না চায়? কিন্তু গরুড় আমার পুত্র চিকুরকে ভক্ষণ করেছে এবং বলেছে একমাস পরে সুমুখ-কেউ খাবে। এই কারণে আমার মনে শান্তি নেই।"

মাতলি বললেন, সুমুখ আমার সাথে ইন্দ্রের কাজে চলুন, ইন্দ্র গরুড়কে নিবারণ করবেন।

তারপর সুমুখকে নিয়ে নারদ ও মাতলি দেবরাজের কাছে গেলেন। তখন সেখানে ভগবান বিষ্ণুও উপস্থিত ছিলেন। নারদের মুখে সকল ঘটনা শুনে বিষ্ণু বললেন, বাসব, তুমি সুমুখকে অমৃত পান করিয়ে অমর কর। ইন্দ্র সুমুখকে দীর্ঘায়ু দান করলেন। কিন্তু অমৃত পান করালেন না। তার পর সুমুখ ও মাতলিকন্যা গুণকেশীর বিয়ে হল।

সুমুখ দীর্ঘায়ু পেয়েছেন জেনে গরুড় রেগে গিয়ে ইন্দ্রকে বললেন, "তুমি আমাকে নাগ ভোজনের বর দিয়েছিলে, এখন বাধা দিলে কেন?"

ইন্দ্র বললেন, "আমি বাধা দিইনি, বিষ্ণুই সুমুখকে অভয় দিয়েছেন।"

গরুর তখন বিষ্ণুকে বললেন, "দেবরাজ, আমি ত্রিভুবনের অধিশ্বর হবার যোগ্য। কিন্তু তবুও আমি অন্যের চাকর হয়েছি। তুমি থাকতে বিষ্ণু আমার জীবন যাপনে কিছুতেই বাধা দিতে পারেন না। তুমি আর বিষ্ণুই আমার গৌরব নষ্ট করেছ। তার পর গরুড় বিষ্ণুকে বললেন, "আমার পাখার একটা অংশ দিয়েই তোমাকে আমি খুব সহজেই বইতে পারি। দেখতে পাবে কে বেশি বলবান।"

বিষ্ণু বললেন, "তুমি অতি দুর্বল হয়েও নিজেকে অধিক শক্তিশালী মনে করছ। অণ্ডজ, আমার কাছে অহঙ্কার করো না। আমি নিজেই নিজেকে বহন করি আর তোমাকেও ধারণ করি। তুমি যদি আমার বাম হস্তের ভার সইতে পার তাহলেই তোমার অহংকার সার্থক হবে। এই বলে

বিষ্ণু তাঁর বাম হস্ত গরুড়ের কাঁধে রাখলেন। গরুড় হতচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে গরুর প্রণাম করে বললেন, "প্রভু, আমি তোমার পতাকাবাহী পাখী মাত্র। আমাকে ক্ষমা কর। তোমার শক্তি জানতাম না তাই মনে করতাম আমার শক্তির তুলনা নেই।"

তখন বিষ্ণু তাঁর পায়ের আঙ্গুল দিয়ে সুমুখকে গরুড়ের বুকে ছুঁড়ে দিলেন। উপাখ্যান শেষ করে কন্ব বললেন, "গরুরের গর্ব এইভাবে নষ্ট হয়েছিল।" বৎস দুর্যোধন, যে পর্যন্ত তুমি যুদ্ধে পাণ্ডবদের সাথে অবতীর্ণ না হচ্ছ সে পর্যন্তই তুমি জীবিত আছ। তাই বলছি তুমি বিরোধ ত্যাগ করে বাসুদেবকে আশ্রয় কর এবং নিজের কুল রক্ষা কর। সর্বজ্ঞানী নারদ জানেন, এই কৃষ্ণই সেই চক্রগদাধর বিষ্ণু।

একথা শুনে দুর্যোধন কন্বের দিকে চেয়ে উচ্চহাস্য করলেন এবং গজশুণ্ডতুল্য নিজের ঊরুতে চপেটাঘাত করে বললেন, "মহর্ষি, ভগবান আমাকে যেমন সৃষ্টি করেছেন এবং ভবিষ্যতে আমার যা হবে আমি সেই ভাবেই চলছি। কেন অকারণে প্রলাপ বকছেন?"

নারদ বললেন, "দুর্যোধন, হিতাকাঙ্খীদের কথা তোমার মেনে চলা উচিত। কোন ব্যাপারে বেশী জেদ ভাল নয়, তার পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর হয়। একটি পুরানো কাহিনী বলছি শোন ঃ
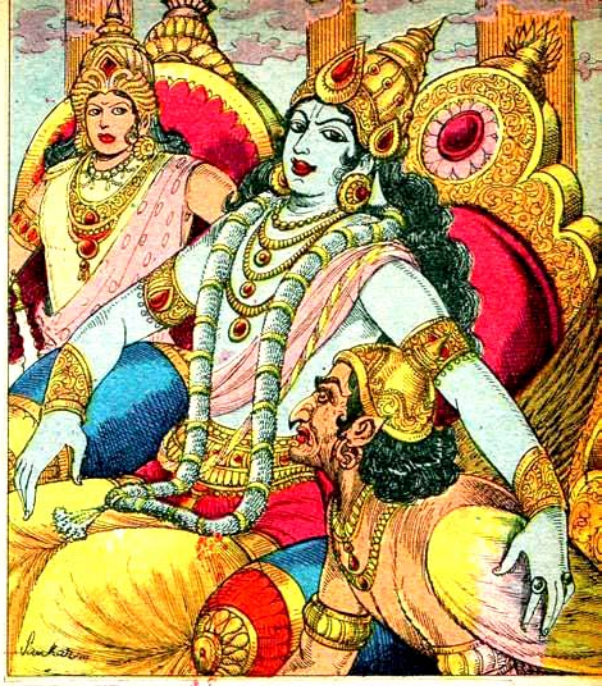
পুরাকালে বিশ্বমিত্র যখন তপস্যা করছিলেন, এই সময়ে শিষ্য গালব তাঁর সেবা করতে লাগলেন। কালক্রমে বিশ্বমিত্র ক্ষত্রিয়ত্ব ত্যাগ করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করলেন এবং প্রীত হয়ে তিনি গালবকে বললেন, বৎস, এখন তুমি যেখানে ইচ্ছে যেতে পার। তখন গালব বললেন, আপনাকে গুরুদক্ষিণা কি দেব? তিনি বার বার এই একই প্রশ্ন করাতে বিশ্বমিত্রের সামান্য রাগ হল। তিনি গালবকে বললেন, তুমি আমাকে এমন আট শত অশ্ব দাও যাদের

বর্ণ চাঁদের মত শুভ্র এবং একটি কান শ্যামবর্ণ।

গালব চিন্তান্বিত হয়ে বিষ্ণুকে স্মরণ করতে লাগলেন। তখন তার সখা গরুড় এসে বললেন, গালব, আমার সাথে এস। তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে। গালব খুব খুশী হয়ে গরুড়ের পিঠে চড়ে পূব দিকে যেতে বললেন। গরুড়ের গতি তীব্রতম। গালিবের অজ্ঞান হওয়ার উপক্রম হল। গালব আস্তে যেতে বলল। আস্তে না গেলে ঘোড়া খুজে পাবে না। তখন গরুড় ঋষভ পর্বতে নিয়ে গিয়ে বলল, "অর্থ হলে সব হয়। আমি ধনী যযাতির কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

শেষে রাজা যযাতির কাছে এসে গালবের গুরুদক্ষিণার জন্য অশ্ব প্রার্থনা করলেন। যযাতি বললেন, "সখা, আমি পূর্বের মত ধনবান নই, কিন্তু এই ব্রহ্মর্ষিকে হতাশ করতেও পারি না। গালব, আপনি আমার কন্যা মাধবীকে নিয়ে যান। রাজারা এই কন্যার শুল্কস্বরূপ নিশ্চয় আপনাকে আট শত অশ্ব দেবেন। আমিও দৌহিত্র লাভ করব।

যযাতির কন্যা মাধবীকে নিয়ে গালব অযোদ্ধার রাজা হর্যশ্বের কাছে গেলেন। তাঁর প্রার্থনা শুনে হর্যশ্ব বললেন, "এই কন্যা অতি শুভলক্ষণা, ইনি রাজচক্রবর্তী পুত্রের জন্ম দিতে পারবেন। কিন্তু আপনি শুল্কস্বরূপ যা চান তেমন অশ্ব আমার মাত্র দুই শত আছে। আমি এই কন্যার গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করব। আপনি আমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।"

মাধবী গালবকে বললেন, "এক ব্রহ্ম-বাদী মুনি আমাকে বর দিয়েছেন, তুমি প্রতিবার প্রসবের পর আবার কুমারী হবে। অতএব আপনি দুই শত অশ্ব নিয়ে আমাকে দান করুন। এর পরে আরও তিন রাজার কাছে আমাকে নিয়ে যাবেন। তাতে আপনার আট শত অশ্ব পূর্ণ হবে। আর আমারও চার পুত্র লাভ হবে।"

গালব হর্যশ্বকে বললেন, "মহারাজ, আমার শুল্কের চতুর্থাংশ দিয়ে আপনি

এই কন্যার গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করুন।”

যথাসময়ে তিনি একটি পুত্র লাভ করলেন। তখন গালব তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনি আপনার আকাঙ্খিত পুত্র লাভ করেছেন, এখন আমার অবশিষ্ট শুল্কের জন্য আমাকে অন্য রাজার কাছে যেতে হবে। সত্যবাদী হর্যশ্ব তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে মাধবীকে ফিরিয়ে দিলেন। মাধবীও পুনরায় কুমারী হয়ে গালবের সঙ্গে চললেন। তারপর গালব একে একে কাশীরাজ দিবোদাস এবং ভোজরাজ উশীনরের কাছে গেলেন। তাঁরাও প্রত্যেকে দুই শত অশ্ব দিয়ে মাধবীর গর্ভে পুত্রের জন্ম দিলেন।

গরুড় গালবকে বললেন, আর এরূপ অশ্ব পাওয়া যাবে না। তুমি এই ছয় শতই বিশ্বমিত্রকে দক্ষিণা দাও।

বিশ্বমিত্রের কাছে গিয়ে গালব বললেন, আপনি গুরুদক্ষিণা স্বরূপ এই ছয় শত অশ্ব নিন আর অবশিষ্ট দুই শতের বদলে এই কন্যাকে নিন। বিশ্বমিত্র মাধবীকে নিলেন আর অশ্বগুলি তাঁর আশ্রমে ঘুরে বেড়াতে লাগল। উপাখ্যান শেষ করে নারদ বললেন, দুর্যোধন, তুমি অভিমান ক্রোধ ও যুদ্ধের অভিপ্রায় ত্যাগ করে পাণ্ডবদের সাথে মিলিত হও।
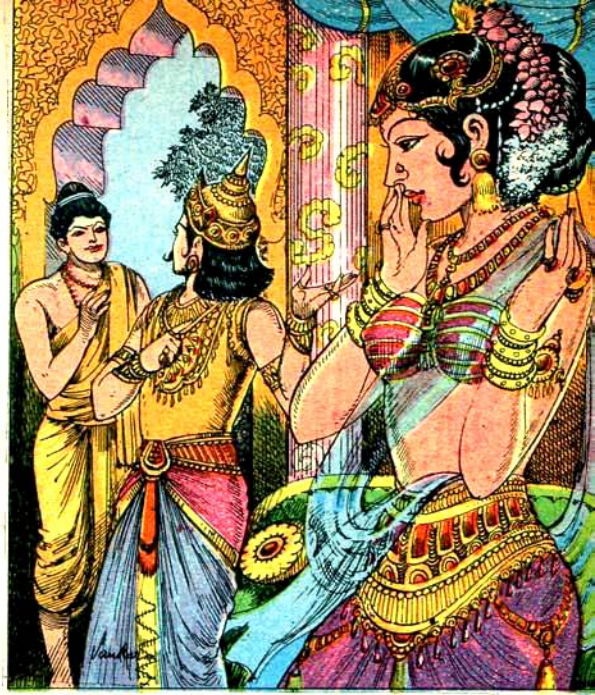
ধৃতরাষ্ট্র বললেন, “ভগবান নারদের কথা সত্য, আমিও তাই চাই কিন্তু আমার শক্তি নেই। কৃষ্ণ, তুমি যা বলেছ তা ধর্মসঙ্গত, অন্যায় নয়। কিন্তু বৎস আমি স্বাধীন নই। দুর্বুদ্ধি পরায়ণ পুত্ররা আমার আদেশ মানবে না। গান্ধারী বিদুর ভীষ্ম প্রভৃতির কথাও দুর্যোধন শোনে না। তুমিই ওই দুর্বুদ্ধিকে বোঝাতে চেষ্টা কর।”

কৃষ্ণ মিষ্ট কথায় দুর্যোধনকে বললেন, “পুরুষশ্রেষ্ঠ, মহাপ্রাজ্ঞ বংশে তোমার জন্ম। শাস্ত্র ও সর্বগুণান্বিত যা ন্যায় সঙ্গত তুমি তাই কর। সৎব্যক্তির প্রবৃত্তি ধর্মসংস্থাপনা দেখা যায়, কিন্তু তোমার

মধ্যেই তার বিপরীত দেখতে পাচ্ছি। সকলেই সন্ধি করতে চান। পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করলে তুমি সব পাবে। অপর পক্ষে যুদ্ধে নামলে তুমি সব কিছু হারাবে। তুমি সন্ধি করলে তোমার হিতৈষী প্রত্যেকে খুশী হবে।"

ভীষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, "বৎস, তুমি কৃষ্ণের কথা শোন। কুপুরুষ হয়ো না, হিতাকাঙ্খীদের কথা অবহেলা করে কুপথে যেয়ো না। পিতা মাতাকে শোক সাগরে ভাসিও না।"

দ্রোণ বললেন, "বৎস, কেশব ও ভীষ্ম তোমাকে ধর্মসঙ্গত মঙ্গলজনক কথাই বলেছেন, তুমি এঁদের কথা রাখ।"

বিদুর বললেন, "দুর্যোধন, মহাত্মা কৃষ্ণের কথা অতিশয় মঙ্গলজনক। তাতে দুর্লভ বিষয়ের লাভ হবে এবং লাভের বিষয় সযত্নে রক্ষা হবে।"

দুর্যোধন কৃষ্ণকে বললেন, "তুমি বিবেচনা না করে পাণ্ডবদের প্রতি ভাল-বাসার মোহে আমাকে নিন্দা করছ। তুমি, বিদুর, পিতা, পিতামহ ও আচার্য দ্রোণ সবাই কেবল আমাকে দোষ দাও, পাণ্ডব-দের দোষ দেখ না। বিশেষ ভাবে চিন্তা করেও আমি আমার ছোট বড় কোনও অপরাধ দেখতে পাচ্ছি না। পাণ্ডবগন দ্যূতক্রীড়া ভালবাসেম সেজন্যই আমাদের সভায় এসেছিলেন। সেখানে শকুনি তাঁদের রাজ্য জয় করেছিলেন তাতে আমার অপরাধ কি? জয়ের ধন ঐশ্বর্য পিতার আদেশে তাঁদের আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার পর আবার তাঁরা পরাজিত হয়ে বনে গিয়েছিলেন, তাতেও আমাদের দোষ হয়নি। তবে কি কারণে তাঁরা কৌরবদের শত্রুদের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের বিনষ্ট করতে চান? কেশব, পূর্বে আমার পিতা পাণ্ডবগণকে যে রাজ্যের অংশ দেবার আদেশ দিয়েছিলেন, আমার প্রাণ থাকতে তীক্ষ্ণ সূচের অগ্রভাগে যেটুকু ভূমি বিদ্ধ হয়, তাও আমি ওদের ছেড়ে দেব না।"

কৃষ্ণ হেসে বললেম, "তুমি আর তোমার মন্ত্রীরা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরশয্যাই লাভ করবে। পাণ্ডবদের ঐশ্বর্যে তুমি হিংসায় কাতর হয়ে শকুনির সাথে মিলিত হয়ে দ্যূতসভার আয়োজন করেছিলে। সব সময় পাণ্ডবদের সাথে তুমি এই ধরণের ব্যবহার করে আসছ। তাহলে কেন তুমি অপরাধী নও? তাঁরা তাঁদের পৈতৃক অংশই চাইছেন তাতেও তুমি রাজী নও। পাপাত্মা, ঐশ্বর্য হারিয়ে ও নিপাতিত হয়ে তোমাকে শেষে সবই দান করতে হবে।"

এই কথা শুনে দুর্যোধন ক্রোধে আত্মহারা হয়ে মহানাগের ন্যায় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। তাঁর ভ্রাতারা, মন্ত্রীরা এবং অনুগত রাজারাও তাঁর অনুগমন করলেন।

কৃষ্ণ বললেন, কুরুবংশের বৃদ্ধগণ খুবই অন্যায় করেছেন, একটা মূর্খের হাতে রাজ্যের ভার দেওয়া হল অথচ তার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আপনাদের বংশের বিনাশ যদি না চান তো অবিলম্বে দুর্যোধন প্রমুখদের বেঁধে পাণ্ডবদের হাতে দিয়ে সন্ধি করুন।

কৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন হয়ে বিদুরকে বললেন, "তাড়াতাড়ি গান্ধারীকে ডাকতো, কথা আছে।"

গান্ধারী এলে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "তোমার ছেলে আমাদের কারো কথা শুনছে না। সিংহাসনের অধিকারী হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের উপদেশ না শুনে অভদ্র আচরণ করে সভা থেকে চলে গেছে।"

মায়ের কথায় কান না দিয়ে দুর্যোধন রেগে গিয়ে শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের কাছে গেলেন। তারা আলোচনা করে ঠিক করলেন, তারাই আগে ভাগে কৃষ্ণকে বাঁধবেন, অপমান করবেন। ফলে পাণ্ডব-দের শক্তির মূল উৎস ধ্বংস হয়ে যাবে।

ওদের এই সিদ্ধান্ত জানতে পেরে সাত্যকি তাড়াতাড়ি কৃতবর্মার কাছে গিয়ে বললেন, "অবিলম্বে আমাদের সেনাদের ব্যূহ বদ্ধ কর। তুমি নিজে সভার দ্বার-প্রান্তে তৈরি থেকো।"

পরে সাত্যকি সভায় গিয়ে কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকে দুর্যোধন প্রমুখদের দুরভিসন্ধির কথা জানিয়ে দিলেন। তারপর তিনি সভায় উপস্থিত সবাইকে ঐ দুরভিসন্ধির কথা জানিয়ে দিলেন।

দুর্যোধনকে আবার ডেকে পাঠিয়ে ধৃতরাষ্ট্র তাকে তিরস্কার করলেন। উক্ত দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করতে বললেন। বিদুরও তাকে ঐ পাপ কাজ থেকে বিরত হতে বললেন।

কৃষ্ণ বললেন, "দুর্যোধন, তুমি মোহাচ্ছন্ন হয়েছ। ভাবছ আমি একা। তাই ভাবছ সহজেই আমাকে বন্দী করতে পারবে। এবার দেখ পাণ্ডবগণের সমস্ত সেনা, অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশীয়গণ, আদিত্য, রুদ্র ও বসুগণ, মহর্ষিগণ সবাই আমার সঙ্গে আছেন। আপনারা নিজের চোখে দেখে নিন। পরক্ষণেই কৃষ্ণের শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে নানান শক্তি বেরুতে লাগল। ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষে রুদ্র, মুখ থেকে অগ্নি এবং অন্যান্য অঙ্গ থেকে ইন্দ্র প্রমুখ দেবতা যক্ষ, রক্ষ গন্ধর্ব, বলরাম ও পঞ্চ-পাণ্ডব বেরিয়ে আসতে লাগলেন। তাঁর কান, চোখ এবং নাক থেকে দাবানল বেরিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। তাঁর ভেতর থেকে স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল—এই তিনটি লোকের মূর্ত রূপ দেখা যাচ্ছিল। তাঁর চোখে সূর্য ও চন্দ্রের উজ্জ্বল প্রকাশ। চুলে অসংখ্য নক্ষত্রের উপস্থিতি।

কৃষ্ণের এই ঘোর মূর্তি দেখে সভায় উপস্থিত সকলে ভয়ে চোখ বুজলেন। শুধু মাত্র ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, সঞ্জয় ও ঋষিগণ কৃষ্ণের এই বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারলেন। কারণ কৃষ্ণ তাঁদের দিব্য দৃষ্টি দান করেছিলেন।

"কিসের এই কোলাহল?" ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞেস করলেন। তারপর কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র-কেও দিব্যদৃষ্টি দান করলেন।

শিবলীলা

[চার]

বদরিকাশ্রমে মুনি দুর্বাস তপস্যা করছিলেন। একদিন দুপুরে অর্চনা হবিশ শেষ করে হরিণ শাবক নিয়ে খেলা করছিলেন। সেই সময় তুম্বুর নামে এক প্রমথ সস্ত্রীক আকাশ পথে যাচ্ছিল। সে হরিণ শাবককে দেখে তুড়ি দিতেই শাবকটি ঘাবড়ে গিয়ে পালিয়ে গেল। ক্রোধী দুর্বাস তুম্বুরকে মানুষের জন্ম ধারণ করার অভিশাপ দিলেন।

তুম্বুর ভয় পেল। আকাশ থেকে নেমে দুর্বাস মুনিকে বলল, "মুনিবর, বাচ্চাদের দেখে যেমন তুড়ি দেয় আমি আপনার হরিণ শাবক দেখে সেই রকম আনন্দে তুড়ি দিয়েছিলাম। তার জন্য আপনি আমাকে এত বড় অভিশাপ দিচ্ছেন। আপনার অভিশাপ তো বদলাতে পারে না। তাই আমি মানব জন্ম নিচ্ছি। আপনি এমন কিছু করুন যাতে মানব জন্ম লাভের পর আমি যেন শিব ভক্ত হতে পারি।" দুর্বাস মুনি তার এই আশা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

দুর্বাসের অভিশাপ অনুসারে তুম্বুর কাঞ্চীপুরের বৈশ্য পরিবারে চিরুতোণ্ড নামে জন্মগ্রহণ করল। তার স্ত্রীও তিরুবেঙ্গনাঞ্চি নামে মানব জন্ম ধারণ করে চিরুতোণ্ডের স্ত্রী হল। তাদের এক পুত্র সন্তান হল। নাম তার সিরিয়াল।

চিরুতোণ্ড বীর শৈবদের মত অনুযায়ী একাম্রনাথের অর্চনা করে শিবভক্তদের যে যা চায় তাই দিত। এটা ছিল তার ব্রত।

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

একদিন তাদের বাড়িতে একজন শিব ভক্ত এল। চিরুতোণ্ডকে আশীর্বাদ দিল। আদর আপ্যায়ন পেয়ে বলল, "বৎস, প্রত্যেক দিন আমি আখের রস দিয়ে শিবের পূজা করে থাকি। এটাই ব্রত। এই ব্রত পালনের জন্য হাতে তৈরি ঘানিতে বানানো ছয় ঘড়া রস চাই।"

চিরুতোণ্ডা খুব খুশী হল। টাকা নিয়ে আখ কিনতে চলে গেল। ছয় ঘড়া রস পেতে হলে একশোটা আখ দরকার। তাই চিরুতোণ্ড একশোটা আখ কেনায় একটা বোঝা হল। কিন্তু সেই বোঝা সে তুলতে পারেনি। মানুষের রূপ ধরে শিব ঐ বোঝা বয়ে দিয়ে গায়েব হলেন।

ব্যাপারটা দেখে চিরুতো অবাক হল। হাতে করে ঘানিতে ফেলে রস বের করল। ছয় ঘড়া রস বের করে সে অতিথিকে দিল। পরে ঐ রসে শিবের পূজা হল।

কৈলাশে শিবকে ঘেমে নেয়ে ফিরতে দেখে পার্বতী তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। শিব পার্বতীকে চিরুতোণ্ডার ব্যাপার জানিয়ে বললেন, "ভক্তের আখের বোঝা বইতে সাহায্য করে ঘেমে গেছি।"

ঐ ভক্তকে দেখার ইচ্ছা পার্বতী প্রকাশ করলেন। তখন শিব ইন্দ্রকে কাঞ্চীপুরে টানা একুশ দিন বৃষ্টি যাতে হয় তার ব্যবস্থা করতে বললেন। শিবের নির্দেশ অনুযায়ী কাঞ্চীপুরে টানা একুশ দিন বৃষ্টি হল। বাইশ দিনের দিন বৃষ্টি থামল। ঐ একুশ দিন চিরুতোণ্ডা কাঞ্চীপুরের শিব ভক্তদের খাওয়াতে লাগল রাতে আর দিনে। কাঠ ফুরিয়ে গেলে নিজের কাপড় তেলে ভিজিয়ে পুড়িয়ে রান্না করল। কোন বাধাই গ্রাহ্য করল না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যেদিন বৃষ্টি থেমে গেল সেদিন একজন অতিথিও চিরুতোণ্ডার বাড়িতে রইল না। চিরুতোণ্ডা আজীবন প্রত্যেকদিন অন্তত একজন অতিথিকে না খাইয়ে খেতো না। সেদিন দুপুরে আঙিনায় এসে দেখে একজন শিবভক্তও নেই। তাই শিবভক্তের খোঁজে চিরুতোণ্ডা

বেরুলো। পাড়ায় পেল না। বাধ্য হয়ে পাড়ার বাইরে গেল শিবভক্তের খোঁজে।

এক উদ্যানের পাশের মন্দিরের কোণে বুড়োবুড়িকে বসে থাকতে দেখল। বুড়োর চুল ধবধবে সাদা। তার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। শরীরে বিভূতি লাগানো। বাঘের চামড়ার উপর শোয়া ছিল বুড়ো। আর বুড়ি তার পা টিপে দিচ্ছিল।

চিরুতোণ্ডা তাদের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করে নিবেদন করল, "আজ আপনারা দুজনে আমার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করে শিব পূজা করে আমাকে কৃতার্থ করুন।"

বৃদ্ধ জবাবে বললেন, "এক বছর ধরে অন্ন ত্যাগ করে শিবের ব্রত পালন করছি। একমাত্র মানুষের মাংস খেয়েই আমার এই ব্রত ভঙ্গ করতে পারি। নরপশু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য জাতের যে কোন একজনের মাংস হলেই চলবে। লোকটার বয়স যত কম হবে ততই ভাল। ছেলের মা-বাবা নিজেদের হাতে ঐ ছেলেকে বধ করবে। রান্না করবে। আর আমাদের সঙ্গে এক সারিতে বসে খাবে।"

"অধীনের নাম চিরুতোণ্ডা। শিবভক্তদের ব্রত যাতে ঠিক ভাবে পালিত হয় সেটা দেখাই আমার ব্রত। আপনি যে ভাবে খেতে চান সেই ভাবেই আপনাকে খাওয়াব। আপনারা আমার বাড়িতে আসুন।" চিরুতোণ্ডা নিবেদন করল।

"শুধু তুমি রাজী হলেই কি আর হবে। তোমার স্ত্রী যদি রাজী না হয়?" বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করল। চিরুতোণ্ডা বাড়ি ফিরে সমস্ত কথা স্ত্রীকে জানাল।

আমরাতো নিজেদের মাংস খাওয়াতেও রাজী আছি। আপনি তাড়াতাড়ি ওদের নিয়ে আসুন আমাদের বাড়িতে।" তিরু-বেঙ্গনাঙ্গী বলল।

ইতিমধ্যে বুড়োবুড়ির ছদ্মবেশে বসে থাকা শিব-পার্বতী অন্যরূপ ধরলেন। শিব অন্য রূপ ধারণ করে সিরিয়ালের পাঠ-শালায় এসে তাকে বললেন, "বাবা, তোমার

বাবা ভীষণ পাজী। তোমাকে হত্যা করে কোন্ এক যোগীকে খাওয়ানোর তালে আছে। এক কাজ কর তুমি এখান থেকে পালাও। তা না হলে আর বাঁচতে পারবে না।" সিরিয়ালকে শিব ভয় পাইয়ে দিলেন।

"আপনার কথা শুনে মশাই আমি আশ্চর্য হচ্ছি। আমাদের পূর্বপুরুষগণ উপদেশ দিয়েছেন, 'পরোপকারার্থ মিদম্ শরীরম্। দধীচি, শিবি প্রমুখ কি জ্ঞানী ছিলেন না ?" সিরিয়াল জবাবে বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যে চিরুতোণ্ডা মন্দিরে ফিরে এল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কাঁধে বসিয়ে ও বৃদ্ধার হাত ধরে নিয়ে এল নিজের বাড়ি।

মা-বাবা সিরিয়ালকে স্নান করাল। তাকে সব রকমের অলঙ্কার পরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, তুমি কি শিবযোগীর আহার হতে প্রস্তুত আছ ?"

"আমি সানন্দে আহার হতে প্রস্তুত আছি।" সিরিয়াল জবাবে বলল।

মা ছেলেকে কোলে শোওয়াল। চিরু-তোণ্ডা ছেলেকে বধ করল। সিরিয়ালের মাংস রান্না করে বুড়োবুড়িকে পরিবেশন করল।

তখন বৃদ্ধ চিরুতোণ্ডাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন ছেলেকে ডেকে আমাদের সঙ্গে খেতে বস।"

"ছেলে আর কোথায়! নিন খান। মাংস ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।" চিরুতোণ্ডা বলল।

"তোমার স্ত্রীকে বল ছেলেকে ডাকতে। ছেলে ফিরে আসবে।" বৃদ্ধ বলল।

তিরুবেঙ্গনাঙ্কী ডাকল, "বাবা, সিরিয়াল, ফিরে এস। সিরিয়াল।"

তখনই দেখা গেল দূর থেকে সিরিয়াল ছুটতে ছুটতে আসছে। চিরুতোণ্ডা অবাক হয়ে ঐ বৃদ্ধ দম্পতির দিকে তাকাল। দেখতে পেল সেখানে বৃদ্ধ বৃদ্ধা নেই। আছে পার্বতী আর পরমেশ্বর। শিব পার্বতী চিরুতোণ্ডার ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে তাকে তার পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত শোনালেন।

<u>বিশ্বের বিস্ময়</u>

ডিপ্লোডক্সের কঙ্কাল

কয়েক কোটি বছর আগে পৃথিবীর মাটিতে নানান ধরণের সরীসৃপ চলে বেড়াত। তাদের মধ্যে সব চেয়ে আকারে বড় যেটা তার নাম হল ডিপ্লোডক্স। তার ওজন হাতীর ওজনের দশগুণ। আমেরিকার ওয়াশিংটনের জাতীয় যাতুঘরে ডিপ্লোডক্সের কঙ্কাল যত্ন করে রাখা আছে। চিত্রে লক্ষ্যনীয়। এই কঙ্কালেরই দৈর্ঘ সত্তর ফুট।

ডিপ্লোডক্স শাকাহারী। ব্রাণ্টোজার্স নামক বিরাটকায় সরীসৃপও নিরামিষাশী। আলোজার্স ও টির্ণোজার্স নামক সরীসৃপগুলো মাংসাশী। কিন্তু এগুলো আকারে ডিপ্লোডক্সের চেয়ে অনেক ছোট। এই সব সরীসৃপ পৃথিবী থেকে কবে লুপ্ত হয়ে গেছে।

ফটো : এস্. পি. সুভেরওয়াল

পুরস্কৃত
টীকা

ফুল ফুটেছে ডালে

পুরস্কার পেলেন
গোপা দাশগুপ্তা

ফটো ঃ প্রাণলাল কে. পাটেল
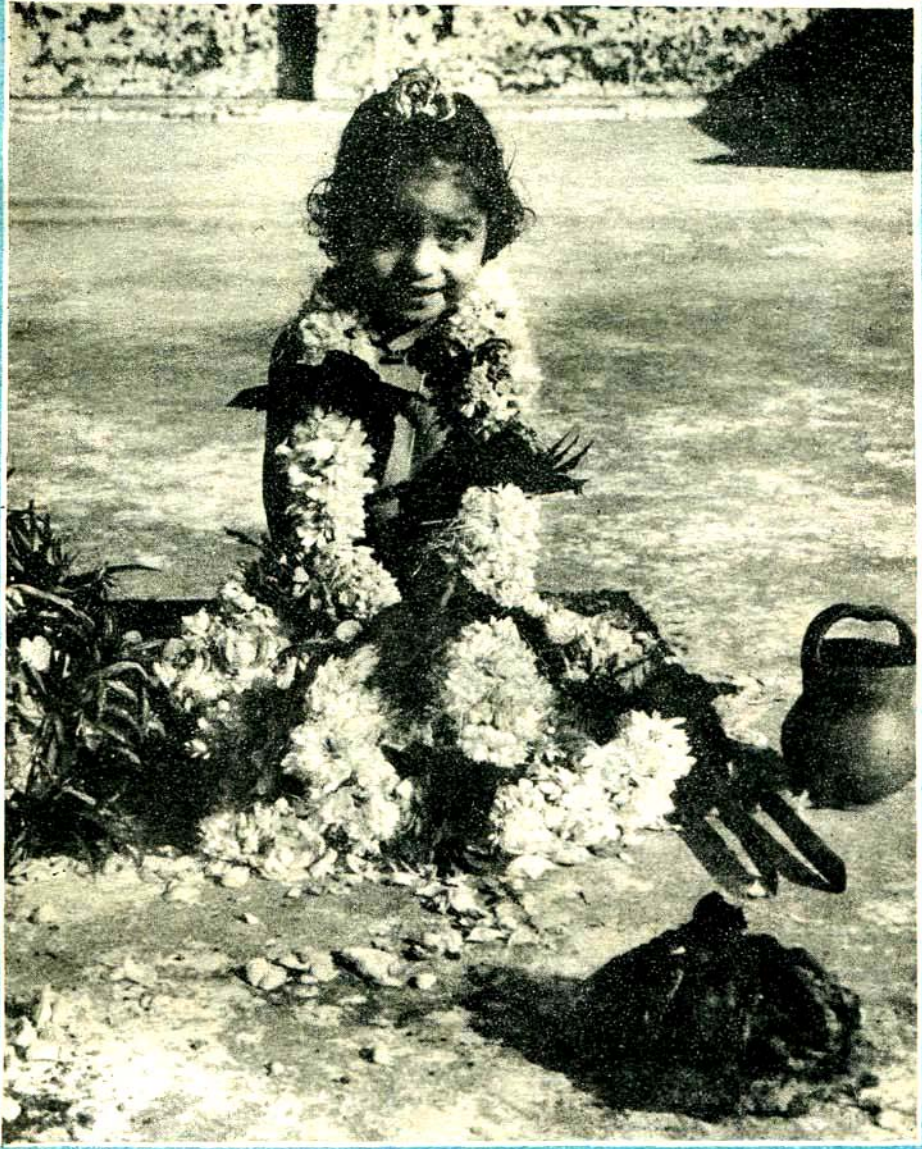
ভূপেন মিত্রের বাড়ি, বাসুদেব-
পুর রোড, শ্যামনগর, ২৪ পঃ

মালা পরেছি গলে

পুরস্কৃত
টীকা

ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতা :: পুরস্কার ২০ টাকা

★

* ফটো-নামকরণ ২০শে জুন '৭৩-এর মধ্যে পৌঁছানো চাই।
* ফটোর নামকরণ দু চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো আগস্ট '৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

গরু

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

বাছুর

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-26. Controlling Editor: "CHAKRAPANI"
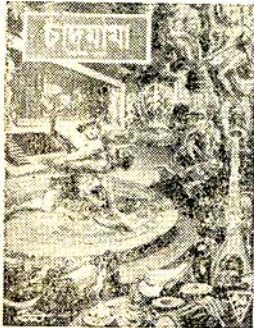
আমাদের
সবার ভাল লাগে
চাঁদমামা
চাঁদমামা
তোমারও লাগবে
ছোট বড় সবাই চাঁদমামা ভালবাসে।
পত্রিকাটি বেরোয়—বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী,
গুজরাতী, তেলুগু, কন্ন, তামিল, মালয়ালম্
আর ইংরেজী মোট দশটি ভাষায়।
মন ভুলানো ছবি আর গল্পেতে ঠাসা।
চাঁদমামা ছোটদের মাসিক পত্রিকা—
কত ছোট হবে বড়, কত বড় হবে ছোট।
আজকেই চাঁদমামা কেনো।
গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন ঃ ডল্টন এজেন্সীস, চাঁদমামা বিল্ডিংস, মাদ্রাজ-২৬

এই চায়ের জনপ্রিয়তা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে আপনাদের চাহিদাতেই

লিপটনের রুবি ডাস্ট

লিপটনের রুবি ডাস্ট চা রাতারাতি লোকের মন জয় করলো কেমন করে—বলুন তো ? এর মূলে কিন্তু আপনারাই ! কেননা, আপনারা চান এমন চা—যার প্রতি প্যাকেটে পাওয়া যাবে ঢের বেশি কাপ চা, গাঢ় লিকার আর মনমাতানো স্বাদগন্ধ ।

একমাত্র প্যাকেটের চা-ই থাকে তরতাজা, থাকে স্বাদেগন্ধে ভরপুর

প্রতি প্যাকেটে পাবেন ঢের বেশি কাপ চা
তাই এর কদর দিন দিন বেড়েই চলেছে

LRDC-8/73 BEN

শিবলীলা